পাথর জীবন

– শরীফুল ইসলাম মোগল

স্কুল জীবনে আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে পড়ুয়া ছাত্রটি ছিল রফিকুল। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে ক্লাসের প্রতিটি পরীক্ষাতেই খুব খারাপ করতো সে। না বুঝে মুখস্থ করার খেসারত স্বরূপ অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু ভুলে যেতো। একাধিক চেষ্টায় এসএসসি–র গণ্ডি পার হলেও এইচ.এস.সি পাস করতে পারেনি সে। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গ্রাম ছাড়ার পর তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একদিন কার কাছ থেকে যেন জানলাম, বিদেশ চলে গিয়েছে রফিকুল।

প্রায় বছর খানেক পর একইভাবে আবার জানলাম, কিছুদিন আগে সে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য ফিরে আসার কারণটা তার এবং তার পরিবারের সদস্যদের নীরবতায় প্রতিবেশী বা সাধারণ দশজনের কাছে বেশ অস্পষ্ট। যাযাদি–র *প্রবাসী* সংখ্যার ঘোষণা পড়ে আমার কাছে এসে তার প্রবাস জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে আমাকে তা লিখে পাঠাতে অনুরোধ করলো। তার ইচ্ছা, বিদেশ গমনেচ্ছুদেরকে প্রতারক ও দালাল চক্রের ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া যাতে তার মতো কষ্টের পথ মাড়িয়ে কাউকে রিক্ত হাতে দেশে ফিরতে বাধ্য হতে না হয়।

তার জবানীতেই শুনুন :

পড়ালেখায় সাফল্যের সম্ভাবনা না দেখে পরিবার থেকে চাপ দিচ্ছিল আমি যেন টেকনিকাল কোনো কাজ শিখি অথবা ব্যবসা শুরু করি। নয় ভাইবোনের স্বল্প আয়ের যৌথ কৃষক পরিবার আমাদের। সাতপাচ ভেবে পড়ালেখার পাট চুকিয়ে কমপিউটার, টিভি, রেফ্রজারেটর মেরামতের ট্রেনিং নিতে শুরু করলাম। ইত্যবসরে সউদি প্রবাসী আমার এক খালাতো ভাই ছুটিতে দেশে এসে আমাকে সেখানে নিয়ে যাবার আগ্রহ দেখালো। মোটা বেতনের চাকরির লোভ দেখিয়ে আমাকে এবং পরিবারের সবাইকেই সে ম্যানেজ করে ফেললো।

আধা পাকা ধানক্ষেতসহ কৃষি জমি, গরু–ছাগল বিক্রি করে এবং চড়া সুদে গ্রামের বিভিন্ন সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে এক লাখ পয়তাল্লিশ হাজার টাকা তুলে দেয়া হলো তার হাতে। সউদি থেকে সে অতিরিক্ত দুটি ভিসা সঙ্গে এনেছিল। ফলে পাসপোর্ট, মেডিকাল ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে মাত্র বিশ দিনের মধ্যেই ফ্লাইটের ডেট পেলাম।

পাশের গ্রামের আমিরুল এবং আমি অতিরিক্ত দুটি ভিসায় তার সঙ্গে যাচ্ছি। অতি দ্রুত ফ্লাইট এবং ভালো চাকরির নিশ্চয়তার কারণে আমাদের দুজনের কাছ থেকে প্রায় তিন লাখ টাকা নেয়া হলো। নিকট আত্মীয় বলে কোনো প্রকার প্রতারণার কথা কখনোই আমাদের ভাবনায় আসেনি। বরং ভাবছিলাম সেখানে গিয়ে দুই হাতে রিয়াল কামাবো, সংসারে সচ্ছলতা আসবে, আমাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে আর আমার মনের মানবীকে বিয়ে করতে পারবো ইত্যাদি। রঙিন চিন্তায় রাতের ঘুম হাওয়া হয়ে গেল। শুধু প্রহর গুণি কখন আসবে ফ্লাইটের তারিখটি।

অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত দিনটি এলো। অশ্রুসিক্ত নয়নে বড় ভাই এয়ারপোর্টে বিদায় জানালেন আমাদেরকে। বিমানে ওঠার পরেই খালাতো ভাইয়ের আচরণ সম্পূর্ণ বদলে গেল। তার আকস্মিক দুর্ব্যবহারে হতবাক হয়ে গেলাম আমিরুল আর আমি। জেদ্দা এয়ারপোর্টে নেমেই আমাদেরকে ফেলে সে কৌশলে কেটে পড়তে যাচ্ছিল। পেছন থেকে দৌড়ে গিয়ে জামা টেনে ধরে তাকে ট্যাকসিতে উঠতে বাধা দিলাম।

আমাদেরকে কোথাও গতি করে না দেয়া পর্যন্ত আমরা তাকে ছাড়তে নারাজ। শেষ পর্যন্ত আমাকে ফাকি দিয়ে তারা দুজন সটকে পড়লো। প্রস্রাব করতে একটা পাবলিক টয়লেটে ঢুকেছি। সেই অবসরে আমার ব্যাগ রেখে

তারা হাওয়া হয়ে গেল। অজানা, অচেনা, ভিন্ন ভাষা আর আইন-কানুনের দেশ। তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম।

তাদের ওপর ভীষণ রাগ হলো। গন্তব্য জানা নেই। সঙ্গে বড় লাগেজ, কোথাও সাহায্য পাওয়া যাবে কি না ভাবছি। এমন সময় দুইজন পুলিশ এলো। তাদের কথা এবং ইশারা কিছুই বুঝতে পারলাম না। ব্যাগ থেকে ভিসা বের করে দেখিয়ে শুধু বললাম হেলপ। পুলিশ গাড়িতে করে আমাকে মালিকের ঠিকানায় পৌছে দিল। আমার মালিকের নাম ছিল মবরুপ।

রাত দশটার দিকে পার্শ্ববর্তী একটা বাঙালি মেসে আমাকে রেখে মালিক বললো, সময় হলে ডাকা হবে।

মেসের বাঙালি ছেলেরা মালিকের কথা আমাকে বুঝিয়ে দিল। ওখানে প্রায় দেড় মাস কাটালাম। কোনো কাজকর্ম নেই। শুধু খাওয়া আর ঘুমানো। এ সময় অবশ্য তাদের কাছ থেকে কিছু আরবি কথাবার্তা শিখে নিয়েছিলাম নিজের প্রয়োজনের কথা ভেবে। মেস বোর্ডারদের কাছ থেকেই আমার ভিসার নিম্নমান এবং মালিকের বদমেজাজের কথা জানতে পারলাম। আমার নাকি কন্ট্রাক্ট ভিসা।

এক্ষেত্রে মবরুপই এ দেশে আমার একমাত্র মালিক এবং তার ইচ্ছানুসারেই চলতে হবে। অন্য কোথাও পালিয়ে গেলে কেউ আমাকে চাকরি তো দেবেই না, উল্টো জেল-জরিমানা নাকি অবধারিত। প্রচুর টাকার বিনিময়ে এই ভিসায় মিথ্যা কথা বলে আমাকে নিয়ে এসেছে শুনে আমার সেই খালাতো ভাইকে তারা ভণ্ড, প্রতারক বলে চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতে লাগলো।

তাদের কথা শুনে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। মনকে প্রবোধ দিলাম এই ভেবে যে, মালিকের অনুগত হয়ে কাজ করলে হয়তো কোনো সমস্যা হবে না।

এক মাস ষোল দিন পর আমাকে কর্মস্থলে নিয়ে যাওয়া হলো। সাত আট ঘণ্টা লাগে ট্যাকসিযোগে সেখানে পৌছাতে। রাতের বেলা এসেছি বলে রাস্তাঘাট কিছুই বুঝতে পারিনি। ভোরের আলো ফুটতেই দেখি চারদিকে শুধু ধু ধু বালি আর পাহাড়। আশপাশে কোথাও ঘরবাড়ি বা জনমানবের চিহ্ন নেই। রান্নার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপকরণসহ পুরনো একটা ওয়ালঘরে আমার থাকার জায়গা নির্দিষ্ট করে মালিক আমাকে কাজ বুঝিয়ে দিল।

বালিযুক্ত পাথুরে মাটিতে তিন ফিট পরিমাণ গর্ত করে লম্বা সারি ধরে সেখানে টমাটো গাছ রোপণ করা, পার্শ্ববর্তী বোরিং থেকে পানি দেয়া এবং প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করাই আমার কাজ। কোদাল, বেলচা, নিড়ানি আর টমাটোর চারা দিয়ে একটা নির্দিষ্ট সীমানা দেখিয়ে আগামী সাত দিনের মধ্যে সে পরিমাণ কাজ করার হুকুমজারি করে মালিক চলে গেল।

দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির মাঝে আমি একা। এখন থেকে একা একা থাকতে হবে, খেতে হবে, কাজ করতে হবে। ভাবতেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে লাগলাম। কিন্তু জীবনযুদ্ধে ভয় পেলে চলবে কেন? উন্নত ভবিষ্যতের হাতছানি আমার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিল। নির্ঘুম, দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তিতে সেদিন কোনো কাজ করলাম না।

পরের দিন সকালে কাজ শুরু করলাম। কিন্তু ছোট-বড় পাথরে ভরা বালি কেটে গর্ত করা যে কি কষ্টকর তা টের পেলাম অল্প সময়ের মধ্যেই। বেলা দশটা এগারোটা থেকে সূর্যতাপের প্রখরতা এতো বাড়তে থাকে যে, পনেরো মিনিটও একটানা কাজ করা যায় না। গা পুড়ে ভাজা ভাজা হয়ে যায় গরমে। তাছাড়া সূর্যতাপে বালি হয়ে ওঠে খুব উত্তপ্ত। অবিরাম বাতাসের প্রবাহে উত্তপ্ত বালিতে চোখ মুখ ভরে যায়।

প্রথম দিনে যে পরিমাণ কাজ করলাম তাতে নির্দেশিত সাত দিনের কাজ শেষ করতে আমার কমপক্ষে বারো তেরো দিন লাগার কথা। পরদিন সকালে গা, হাত, পায়ের ব্যথায় বিছানা থেকে আর উঠতে পারিনি। হাতে ফোস্কা পড়েছে। তবু মালিককে সন্তুষ্ট করার চিন্তায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

খুব ভোরে শুরু করে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করতে লাগলাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই শরীর কাহিল হয়ে পড়লো।

মালিক এসে কাজ দেখে খুব একটা সন্তুষ্ট তো হলোই না, বরং পরবর্তী সপ্তাহে কাজের পরিমাণ প্রায় দেড়গুণ করে দিল। পরিশ্রমের আগাম চিন্তায় ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলাম। কিন্তু বিকল্প কিছুই করার ছিল না। *ডু অর ডাই* নীতিতে দ্বিগুণ বেগে কাজ শুরু করলাম।

একদিন এক নিগ্রো এলো আমার সঙ্গে পরিচিত হতে। দানবীয় চেহারা। সাত ফিটের মতো লম্বা, ইয়া মোটা আর কুচকুচে কালো। তার নাম উমার, প্রবাসী সুদানিজ। আমার মালিকেরই খাদেম। আমার থেকে পাচ ছয় মাইল দূরে থাকে। দুম্বা চরানো তার কাজ।

প্রায় দেড় মাস একটানা কাজ করে তিন একর মতো জমিতে টমাটোর চারা রোপণ করলাম। এ সময়ের মধ্যে নিজে শুকিয়ে প্রায় কাঠ হয়ে গেলাম। রোদে পুড়ে গায়ের চামড়া কালো হয়ে যেতে লাগলো। থুথু ও কফের সঙ্গে শুধু বালি উঠতো। একরাতে কাজ শেষে ঘরে ফিরে লাইট জ্বালাতেই দেখি বিছানার ওপর শুয়ে আছে দুটি সাপ। সারাক্ষণ লাইট জ্বেলে সাপের ভয়ে কয়েক রাত বাইরে জেগে কাটালাম। মালিক এলে সাপের কথা জানালাম।

উত্তরে মালিক যা বললো তাতে ভয় শতগুণ বেড়ে গেল। রাতে ঘরের বাইরে যেতে একদম নিষেধ করলো। রাতে নাকি পাহাড় থেকে প্রচুর বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে আসে। তাছাড়া দুই একটা পাহাড়ি হিংস্র বুনো কুকুরও নাকি হানা দেয় বাইরে। আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে একাধিক লাইট জ্বেলে ভালোভাবে মশারি টাঙিয়ে আবার ঘরে ঘুমাতে লাগলাম। সাপের ভয়ে রাতে বেশি সময় জেগে থাকতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু পরিশ্রমজনিত চরম ক্লান্তিতে নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়তাম। এদিকে দিনের পর দিন কাজের চাপ বেড়েই চলেছে। টমাটোর চারা পরিচর্যার পাশাপাশি যোগ হয়েছে খেজুর গাছের কাটা ছড়ানো এবং দুম্বার জন্য খেজুর বাগানের ঘাস কেটে তা শুকানো।

ক্রমবর্ধমান কাজের চাপের পাশাপাশি সামান্যতম ত্রুটির জন্য মালিকের গালমন্দ এবং প্রহারের হুমকি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। মালিক যখন গালমন্দ করতো বা পেটানোর হুমকি দিতো তখন যে নিজেকে কতো অসহায় লাগতো তা বোঝাতে পারবো না। অথচ আমার সামর্থের সর্বশেষ প্রচেষ্টা দিয়ে প্রতিটি কাজ করার চেষ্টা করতাম সব সময়।

ভোর রাতে শুরু করে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করতাম প্রতিদিন। দুইবারের পরিবর্তে একবার মাত্র রান্না করতাম। তবু কেন জানি দিন দিন আমার কাজের প্রতি মালিকের অসন্তোষ বাড়তে লাগলো। এরই মাঝে একদিন বিকেলে মালিকের সঙ্গে এসে আমিরুল আমার সঙ্গে কাজে যোগ দিল। আমার সেই প্রতারক খালাতো ভাইয়ের প্রতারণা থেকে সেও রক্ষা পায়নি।

ধু ধু মরুভূমিতে একাকিত্বের মাঝে তাকে পেয়ে তার প্রতি আগের রাগ, ক্ষোভ ভুলে গেলাম। দুজন এক সঙ্গে নবউদ্যমে কাজ করতে শুরু করলাম। ইতিমধ্যে টমাটো ধরে পাকতে শুরু করেছে। আমাদের দেশের বেলের মতো বেশ বড় আকৃতির খুব মিষ্টি স্বাদের টমাটো। টমাটোর ফলনও খুব ভালো। একদিন পর পর টমাটো তুলে কার্টনে ভরে ট্রাকে লোড করে দিতে হতো আমাদের দুজনকে। তারপর প্রায় দুই মাইল পরিমাণ রাস্তায় বালির ওপর কাঠের টুকরো বিছিয়ে ট্রাক চলতে সাহায্য করতে হতো। বালিতে যাতে ট্রাকের চাকা আটকে না যায় সে জন্য এই ব্যবস্থা করতে হতো। ধীরে ধীরে ট্রাক চলতো আর আমরা পেছনের কাঠের টুকরোগুলো সামনে এনে রাস্তা তৈরি করে দিতাম ধারাবাহিকভাবে।

মাঝের দিনটিতে খেজুরের পুং ফুলের মোচা কেটে স্ত্রী ফুলের মোচার মাঝখানে বিশেষ কায়দায় বেধে দিতে হতো পরাগায়ণের জন্য এবং দুম্বার জন্য শুকনো ঘাস মাথায় করে উমারের কাছে দিয়ে আসতে হতো।

টমাটোর মরসুম শেষ হলে ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করে দেয়া হলো। আমাদের নতুন কাজ শুরু হলো। জমি থেকে পাথরের টুকরো পরিষ্কার করে তাতে বিশেষ পদ্ধতিতে চারা লাগানো। প্রখর রোদে পাথর এতো বেশি গরম হতো যে তাতে হাত দিলেই হাতে ফোস্কা পড়ে যেতো। হাতে মোটা কাপড় বেধে কোনো রকমে কাজ করতাম।

কাজের সময় বাতাসে মাটির গরম ভ্যাপসা যখন চোখেমুখে লাগতো তখন মনে হতো যেন জ্বলন্ত উনুন। নিম্নমানের খাবার আর অত্যধিক পরিশ্রমে দিনে দিনে আমাদের শরীর ভেঙে পড়তে লাগলো।

মালিক নির্দেশিত দশ দিনের মধ্যে আমরা অন্যান্য কাজের চাপে তিন একর জমিতে লেবুর চারা রোপণ করতে ব্যর্থ হলাম। কোনোভাবেই তা সম্ভবও ছিল না। কমপক্ষে পনেরো বা বিশ দিন লাগার কথা। মালিকের টার্গেট পূরণে ব্যর্থতার অপরাধে আমাদের ওপর শাস্তি অর্পিত হলো। পরবর্তী দশ দিনের জন্য পাচ কেজির স্থানে মাত্র দুই কেজি চাল দেয়া হলো আমাদের। কাচা খেজুর, পচা টমাটো আর সামান্য পরিমাণ ভাত খেয়ে ছয় দিন পার করলাম। সপ্তম দিনে দুজনেরই ডায়ারিয়া শুরু হলো।

খাদ্য নেই, ওষুধ নেই, পানি নেই। নিদারুণ এক করুণ বাস্তবতার মুখে দাড়িয়ে আমরা শুধু আল্লাহ আল্লাহ করেছি। তিন চার দিন পর সুস্থ হলাম বটে তবে ক্ষিধের জ্বালায় উঠে দাড়ানোর মতো শক্তি নেই। সে অবস্থায়ও মালিক আমাদেরকে কাজ থেকে রেহাই দেয়নি। দশ দিন পর এসে চাল ও কাচা তরকারি দিল ঠিকই তবে কাজের পরিমাণও বাড়িয়ে প্রায় দ্বিগুণ করে দিল।

গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাপের উপদ্রব বৃদ্ধি পেল। এক রাতে এশার নামাজ পড়ছি আর আমিরুল বিছানায় বসে আছে। হঠাৎ চিৎকার করে ঘর থেকে দৌড় দিল আমিরুল। নামাজ ফেলে আমিও দে ছুট। আমিরুল নাকি তিনটা সাপ দেখেছে ঘরের মধ্যে। ভয়ে ঘরমুখী হতে সাহস পেলাম না।

শেষমেষ সাহায্যের আশায় রাত দুপুরে উমারের কাছে গেলাম। উমার একটা লাঠি নিয়ে আমাদের সঙ্গে এলো। বলে রাখা ভালো, আমাদের শোবার ঘরটা ইটের তৈরি। কিন্তু মেঝেতে বালির ওপর ইট বিছিয়ে তার ওপর পাচ ছয় স্তরে কার্পেট বিছানো ছিল।

সকালবেলা উমার ঘর থেকে থালা–বাটি, গ্যাসের চুলা সব কিছু বের করে দিল। তারপর কার্পেট উচু করতেই বেরিয়ে পড়লো যেন সাপের একটা মিনি চিড়িয়াখানা। সাপে গিজ গিজ করছে চারদিকে। ভয়ে তো আমাদের আত্মারাম খাচা ছাড়া হওয়ার যোগাড়। এতো সাপের মধ্যে এতোদিন বাস করছি আমরা! ভাবতেই শরীর হিম হয়ে আসতে লাগলো। উমার সমানতালে পিটিয়ে সাপ মারতে লাগলো। তার সাহস দেখে আমরা তো অবাক। সেও জানে কোনো উপায়ে সাপে একটা কামড় দিলেই পাচ মিনিটের মধ্যে তার ভবলীলা সাঙ্গ হবে। কিন্তু মৃত্যু ভয়ে সামান্যতম বিচলিত মনে হলো না তাকে। বরং *লাঠির আগায় ভূত পালায়* বাঙালির এই প্রবাদকে সত্য প্রমাণ করে তার লাঠির ভয়ে সাপ দ্বিগ্বিদিক ছুটে পালাতে লাগলো।

সে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। সেদিন সে সাকুল্যে ঊনিশটি সাপ মেরেছিল। তারপর থেকে রাতে আমরা পালাক্রমে ঘুমাতাম। একজন ঘুমাতাম আরেকজন জেগে পাহারা দিতাম। শারীরিক অসুস্থতা, সাপের উপদ্রবে রাতে ঘুম না হওয়া এবং সর্বোপরি সামর্থের তুলনায় পরিমাণে বেশি হওয়ায় পরবর্তী পনেরো দিনে কর্মক্ষেত্রে আমরা মালিকের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হলাম।

শাস্তিস্বরূপ এবার মালিক খাদ্য বন্ধ করে দিল এবং দুজনেরই গায়ে হাত তুললো। পেটে ভাত নেই, অসুস্থতায় শরীর চলে না। পারি না রাতে শান্তিতে ঘুমাতে। ছয় মাসের বেতন বকেয়া। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করার পরেও এতো শাস্তি! বাড়িতে টাকা পাঠানোর তাগিদ সত্ত্বেও দুই মাসের বেতন দুই হাজার রিয়াল থেকে মাত্র পনেরোশ রিয়াল পাঠাতে পেরেছি তাও ছয় মাস আগে।

বুঝতে পারছি জায়গা–জমি বিক্রি করে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়িতে সবাই খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে। এদিকে আমিও যে এমন করুণ অবস্থার মধ্যে আছি তা ইচ্ছা করেই কখনো জানাইনি। কষ্টের কথা, দেশের কথা আর টাকার কথা ভেবে শুধু কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতাম।

একদিন রাতে ঘুমাতে যাবার আগে আমার পায়ে পাহাড়ি কাকড়া বিছা কামড় দিল। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলাম। বিষের তীব্রতায় অল্প সময়ের মধ্যেই জ্ঞান হারালাম। দীর্ঘ আটাশ ঘণ্টা পর পরের দিন রাতে হুশ ফিরে পেয়ে দেখি সাপের ভয়ে মশারি টাঙিয়ে বিছানায় বসে আমার মাথায় হাত বোলাচ্ছে আমিরুল।

আমার জ্ঞান ফিরতে দেখে আমিরুল হু হু করে কাদতে শুরু করলো। দুজন রাতভর পাল্লা দিয়ে শব্দ করে কাদলাম। কিন্তু আমাদের কান্না শোনার যে কেউ ছিল না। ভাগ্যকে মেনে নিয়ে আরো কিছুদিন কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে কাটালাম। এভাবে আস্তে আস্তে এক সময় ভাগ্য বিড়ম্বনার চরম বিন্দুতে পৌছে গেলাম।

একদিন উমারের কাছে দুম্বার জন্য শুকনো ঘাস পৌছে দিয়ে এসে দেখি গম্ভীর মুখে মালিক বসে আছে। আমাকে দেখামাত্র চরম উত্তেজিত হয়ে গালমন্দ এবং চড়–থাপ্পড় মারতে লাগলো। শুনলাম আমিরুল নাকি কিছুক্ষণ আগে মালিককে উমারের সেই সাপ মারা লাঠি দিয়ে ধোলাই দিয়ে পালিয়েছে। মালিকের ধারণা, এটি আমাদের পূর্ব পরিকল্পিত এবং সে জন্যই আমার ওপর ঝাপিয়ে পড়েছে সে।

পা জড়িয়ে ধরে অনেক অনুনয়–বিনয় করে শারীরিক অত্যাচার থেকে রেহাই পেলাম। কিন্তু আমাকে পুলিশে দেয়ার জন্য সে জোর করে গাড়িতে তুলতে চেষ্টা করলো। করজোড়ে মিনতি করে তার সে চেষ্টা থেকেও বাচলাম। তবে সে রান্নার হাড়ি–পাতিল, চাল, ডাল, তরকারি, গ্যাসের চুলা সব কিছুই নিয়ে গেল।

জীবনের সবচেয়ে কঠিন বাস্তবতার মুখে দাড়িয়ে চোখের পানি, নাকের পানিতে শরীর ভিজে একাকার হতে লাগলো। কি করবো বুঝতে পারলাম না।

শেষমেষ জীবনে যা কখনো ভাবিনি তা করতে হলো আমাকে। লেবুর শরবত, দুম্বার জন্য রক্ষিত পচা খেজুর, ঘাস আর বোরিংয়ের নোনতা পানি খেয়ে কাটালাম আট দিন। ক্ষিধের যে কি যন্ত্রণা তা জীবনে টের পেয়েছি হাড়ে হাড়ে। ভাগ্য দোষে অত্যাচার, অনাহারে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে পা বাড়াচ্ছিলাম। ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত পরিশ্রম, অর্ধাহার–অনাহারে শরীরটা কংকালসার হয়ে গেছে। রোদে পুড়ে শরীরের রঙ আলকাতরার মতো হয়েছে আর মুখটা হয়েছে হনুমানের মতো।

জানি না কোন প্রজন্মের কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে আমাকে। আমার সে সময়ের দুঃখ–কষ্ট আর করুণ পরিস্থিতির কথা লিখে হয়তো আপনাদেরকে বোঝাতে পারলাম না। আমার স্থানে যদি আপনারা নিজেকে কল্পনা করে পরিস্থিতি বিবেচনা করেন তাহলে হয়তো অনুধাবন করতে পারবেন আমার তখনকার যন্ত্রণাক্লিষ্ট কষ্টকর প্রকৃত অবস্থা। তখন শুধু পশুরূপী আমার সেই খালাতো ভাইটির কথা মনে পড়তো। ভালো চাকরির কথা বলে যে আমাকে প্রতারণার আশ্রয়ে এখানে নিয়ে এসে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে পালিয়েছে।

এ ঘটনার আট দিন পর মালিক এসে গামছা দিয়ে হাত বেধে আবারও পুলিশে দেয়ার জন্য গাড়িতে ওঠানোর চেষ্টা করতে লাগলো। হাত বাধা অবস্থায় তপ্ত বালিতে গড়াগড়ি খেয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু তার মন গলে না। এভাবে কেটে গেল প্রায় দেড় ঘণ্টা। হঠাৎ মালিকের ছেলে এসে উপস্থিত হলো। সে আমার পক্ষ নিয়ে জেলের পরিবর্তে আমাকে দেশে পাঠাতে তার বাবাকে রাজি করালো।

টাকার চেয়ে জীবনকে মূল্যবান ভেবে দেশে ফিরতে রাজি হলাম। মালিক আমাকে সাত মাসের বকেয়া বেতন দিল না। তার ছেলে শুধু কেজি পাচেক খেজুর আর একশ রিয়াল হাতে ধরিয়ে বিমানের টিকেট কেটে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দিল।

দুঃখের বিষয়, ঢাকায় পৌছে এয়ারপোর্ট থেকে খেজুরের প্যাকেটটি লাপাত্তা হয়ে গেল। ভগ্ন শরীরে, রিক্ত হাতে বাড়িতে ফিরলাম। বাড়িতে এসে সুস্থ জীবন ফিরে পেতে মাসাধিককাল ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে বেড

রেস্টে থাকতে হয়েছিল। দেশে সহায়–সম্বলহীন, ঋণের বোঝা বয়ে বেড়ানো পরিবারের করুণ গল্প না ই–বা শুনলেন।

ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় যেসব ভাইয়েরা বিদেশ গমনে ইচ্ছুক তাদেরকে শুধু এটুকু বলবো, বিদেশ গিয়ে যে পরিমাণ পরিশ্রম আমাদেরকে করতে হয় তার সিকি পরিমাণ করলেই দেশে সম্মানজনক ও সচ্ছল জীবন যাপন সম্ভব। আর নিতান্তই বিদেশ যেতে চাইলে ভিসা যাচাই করে, ভালো চাকরির ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তবেই যাবেন। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন সব সময়।

গোপালপুর, কুষ্টিয়া থেকে

ক্ষমার অযোগ্য

– নূর

বাংলাদেশে সরকারি ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে একুশ বছর আগে সউদি আরব আসি। খবর পেলাম তেল মন্ত্রণালয়ের একটি অঙ্গসংস্থায় লোক নেবে। আবেদন করলাম। ইন্টারভিউ দিলাম। চাকরি হলো। আকর্ষণীয় বেতন। রাউন্ড ট্রপ এয়ার টিকেট, চিকিৎসা, বাসা ভাড়া সব ফ্রি।

এগারো মাস চাকরি করে পেলাম ছুটি। দেশে গেলাম। বিয়ে করলাম। চার মাসের মধ্যে আমার স্ত্রী চলে এলেন দেশ থেকে আমার প্রবাস জীবনের একাকীত্ব দূর করতে। সুখের সংসারে এলো দুটি জমজ ছেলে। সংসারের খুশির বন্যা যেন উপচে পড়ছে।

ছয় বছর পর এলো একটি মেয়ে সন্তান। মেয়েটির জন্মের দুই মাস পর শুরু হলো উপসাগরীয় যুদ্ধ। বাসা ছিল এয়ারবেসের পাশে। বোমারু বিমান যখন উঠানামা করতো তখন আমার দুই মাসের মেয়ে ভয়ে গগনবিদারী কান্নায় চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যেতো। যুদ্ধের সময় আমি পরিবারকে সময় দিতে পারতাম না। কারণ আঠারো বিশ ঘণ্টা অফিসে থাকতে হতো। অবশ্য যুদ্ধের প্রথমদিকে ওভারটাইম দিলেও কয়েক মাস পরে অজানা কারণে অতিরিক্ত টাকা দিতো না।

প্রবাসী কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে হঠাৎ করে পয়ত্রিশ ভাগ বেতন বাড়িয়ে দিল। তবে শর্ত আরোপ করলো, এই বৃদ্ধি শুধু যুদ্ধ যতোদিন চলে ততোদিন অব্যাহত থাকবে।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এক পর্যায়ে বিদেশিদের বর্ধিত বেতন বন্ধ করে দিল। কিন্তু এ দেশের নাগরিকের বর্ধিত বেতন অব্যাহত রাখলো। অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি, স্বদেশির চেয়ে বিদেশিরা কাজ করেছে বেশি। মনের দুঃখে অন্য বিদেশির মতো আমিও চাকরি ছেড়ে দেশে চলে এলাম। বলা বাহুল্য, অনেক আগে আমার ছোট ভাইকে এখানে এনেছিলাম ফ্রি ভিসা নিয়ে। ভাই ছিল বেকার।

দেশে আসার আগে ভাইকে কয়েক হাজার রিয়াল দিয়ে বললাম আমার জন্য একটি ভিসা পাঠাতে। আরো বললাম, দেশ থেকে আমি এসে দুই ভাইয়ে মিলে রিয়াদে ব্যবসা করবো।

কয়েক মাসের মধ্যে ভাইয়ের পাঠানো ভিসা দিয়ে নতুনভাবে আবার রিয়াদ এলাম। রিয়াদ এসে উভয় সমস্যা দেখা দিল। একদিকে বেকার, অন্যদিকে দেশে পরিবার। প্রথম সপ্তাহে বুঝতে পারলাম স্ত্রী, ছেলেমেয়ে থেকে দূরে থাকা কতো কষ্টকর। কয়েক মাস রিয়াদে ঘুরে কয়েকজন বাংলাদেশি থেকে একটি খালি দোকান কিনলাম যার অবস্থান রিয়াদস্থ বাংলাদেশি মার্কেটে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এখানে যে কোনো বিদেশি ব্যবসা করতে গেলে নিজের নামে করা যায় না। এ দেশের নাগরিকের নামে করতে হয়।

দীর্ঘ প্রবাস জীবনের সব সঞ্চয় দিয়ে সাজালাম একটি মিনি সুপারমার্কেট। দোকান ভালোই চলছিল। দুই ভাইয়ের স্পন্সর ছিল একই ব্যক্তি। ইতিমধ্যে আমার পরিবারকে আবার আনলাম। উনিশ মাস দোকানটা

চালানোর পর ১৯৯৫ জানুয়ারির ১০ তারিখে দেশে গেলাম একা বিশেষ প্রয়োজনে। দোকানের দায়িত্ব দিলাম ছোট ভাইকে। ২০ জানুয়ারি ১৯৯৫–এ দেশ থেকে ফিরে পরদিন দোকানে গিয়ে দেখি ক্যাশে অন্যলোক বসা। জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই কই?

তিনি বললেন, দোকান আপনি কেনার সময় ক্রেতার নামের জায়গায় আপনার ছোট ভাইয়ের নাম দিয়েছিলেন। তিনি দোকান আমাকে বিক্রি করে স্পন্সরকে নিয়ে স্পেন চলে গেছেন। আর আসবেন না সউদি আরবে। শুনে মনে হলো আমার মাথায় বোমা পড়েছে। যিনি দোকানটা কিনেছেন তিনিও আমাদের স্পন্সরের লোক। স্পন্সরের অফিসে গিয়েও কোনো সন্তোষজনক উত্তর পেলাম না। আমি তর্ক করাতে আমাকে বললো, দোকান ছিল তোমার ভাইয়ের নামে, যার দোকান সে বিক্রি করেছে। আমরা তো বাধা দিতে পারি না।

আমার প্রাইমারি কম শিক্ষিত ভাইয়ের এতো বুদ্ধি কে দিল তা আমার ছোট মাথায় কখনো আসেনি। শুনেছি সে স্পেনে সুবিধা করতে না পেরে ইটালিতে পাড়ি জমিয়েছে। ভাইয়ের সঙ্গে আজ পর্যন্ত দেখা হয়নি। দোকান বাবদ কোনো টাকাও পেলাম না।

আমার অবর্তমানে আমার দোকান বিক্রি করে সে যে সউদি আরব ছেড়েছে তা আমার স্ত্রী, ছেলে–মেয়ে কেউ জানে না। এতো বড় বেইমানি সহ্য করতে না পেরে শরীরে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জটিল রোগে বাসা বেধেছে। এখন আমার অবস্থা অনেকটা জিন্দা লাশের মতো। আমার পরিবার এখন দেশে।

এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারে থাকা অবস্থায় আমার আব্বা মারা যান। অনেক কষ্ট করে বি.এ পাস করি। অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি সৎমা, সৎভাই ও সৎবোনের জন্য।

ছোট সৎভাই এখন স্পেনে। দেশের বাড়িতে বিল্ডিং করেছে। তারা সবাই প্রতিষ্ঠিত। আমি জীবন যুদ্ধে অনেকটা পরাজিত সৈনিকের মতো। সকাল–বিকাল ইনসুলিন নিতে হয়। জানি না আর কতোদিন বাচবো! তবে সৎভাইকে শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ ক্ষমা করলেও আমি ক্ষমা করবো না।

সউদি আরব থেকে

ফ্রম প্রবাসী টু প্রধানমন্ত্রী

– আলী হোসেন চৌধুরী

আমি গত আঠারো বছর ধরে ইওরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্যে শ্রম বিক্রি করতে গিয়ে যা দেখেছি, জেনেছি বুঝছি তা কেবলই একজন শ্রমিকের দেখা। এর থেকে কিছু ঘটনা সারসংক্ষেপ জানাবো। আমি বিশ্বাস করি এই লেখার প্রতি বর্তমান সরকার গুরুত্ব দেবে এবং প্রধানমন্ত্রী দ্রুত একশন নেবেন।

এক. বিজ্ঞাপন

বিএনপির ১৯৯১–৯৬ শাসন আমলে বেতার–টিভিতে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার হতো – *ম্যানপাওয়ার ক্লিয়ারেন্স ছাড়া বিদেশ যাবেন না, পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি এজেন্টকে দিলে আপনি প্রতারিত হয়েছেন বলে জানবেন।* এখন এই শঠতাপূর্ণ সরকারি বিজ্ঞাপনটি প্রচার হয় কি না জানি না। তবে কথা হলো, আমার মতো একজন সাধারণ নাগরিক গ্রাম থেকে শহরে এসে হাত বদল না হয়ে ওই পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে কেমন করে আসবো? কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট টাকা নিয়ে রিসিট দেয় না। প্রশ্ন উঠতে পারে, রিসিট ছাড়া টাকা দেন কেন? উত্তর, উপায় যে নেই।

দুই. এয়ারপোর্ট

যে কোনো প্রবাসীর (শ্রমজীবী) কাছে ঢাকা এয়ারপোর্ট একটি আতংকের নাম। সাতশ ত্রিশ দিন প্রতীক্ষার পর প্রিয়জন মিলনের উদ্দেশ্যে যখন দেশে যাই, বিমান থেকে নেমে জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে দাড়াই তখন মনে হয় কাস্টমস ইমিগ্রেশন যেন ভিক্ষুক, ছিনতাইকারী। মনে হয় এক একজন যমদূত। এরা প্রথমে মাল নেবে, পরে প্রয়োজন মনে করলে জানটাও নেবে। এই চার স্তর পুলসিরাত পেরিয়ে প্রিয়জনদের সান্নিধ্য পাওয়া এক পরম সৌভাগ্য। ফিলিপিন্স, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, সামরিক শাসনের দেশ মিয়ানমার–এর রয়েছে প্রবাসীদের জন্য এয়ারপোর্টে শুল্কমুক্ত কাউন্টার। এমনটা আশা করা কি আমাদের জন্য অন্যায়?

তিন. ব্যাংকিং

সিংগাপুরে দেড় বছর হতে চললো অগ্রণী এক্সচেঞ্জ চালু হয়েছে। সেখানে টাকা পাঠাতে গেলে প্রথমেই যে প্রশ্নটির মুখোমুখি হতে হয় তা হলো, কি জন্য এসেছেন ভাই? মেজাজ ঠিক থাকলে জবাব দিই, টাকা পাঠাবো। মেজাজ বিগড়ে গেলে জবাব দিই, আপনাদের রূপ দেখতে। অযথা ফোন আলাপ, পরিচিত বা আত্মীয়দের সামনে বসিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ, তারই ফাক–ফোকর দিয়ে দাড়িয়ে থেকে টাকা পাঠাই। রেট মনে করুন ৩৩.০৫ টাকা প্রতি সিংগাপুর ডলার+পাচ ডলার সার্ভিস চার্জ। এই ব্যাংক থেকে মাত্র পাচ সাত গজ দূরে রয়েছে কবি মার্কেট, যেখানে হুন্ডিওয়ালারা অতি আদর যত্নে টাকা নেবে এবং ঘরে পৌছে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেবে। রেট ৩৪.৫০ এবং কোনো সার্ভিস চার্জ নেই। এই মুক্তবাজার প্রতিযোগিতায় আমরা কোথায় যাবো? এখানকার ব্যাংক খোলে সকাল নয়টায়, বন্ধ হয় রাত সাড়ে আটটায় (স্থানীয় সময়)। কার স্বার্থে? নয়টা থেকে পাচটা পর্যন্ত বাংলাদেশে কাজ ফাকি দিয়ে কেউ ব্যাংকে যেতে পারে, এখানে সম্ভব নয়। আমাদের জন্য প্রয়োজন সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত প্রতিদিন।

চার. দূতাবাস

দূতাবাস আমাদের জন্য কোনো কাজে আসে না। এখানে পাসপোর্ট (আর্জেন্ট ফিসহ) রিনিউ করতে সময় লাগে তিন দিন। দুদিন কাজ ছেড়ে এই পাসপোর্টের জন্য দৌড়াতে হয়। এক ঘণ্টায় এই পাসপোর্ট রিনিউ করা সম্ভব। বিদেশি শ্রমিক (দক্ষ ও অদক্ষ এবং টেকনিশিয়ান) নিয়োগের বিষয়ে স্থানীয় পত্রিকায় যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় তার পুরোটাই লুফে নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে যোগাযোগ করে ইনডিয়া। বাংলাদেশ দূতাবাস এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কখনো জানিয়েছে বলে শুনিনি। মুক্ত প্রতিযোগিতার এই সিংগাপুরে (১৯৯৯ থেকে) বিদেশিদের আকর্ষণীয় সুযোগ দিয়েছে সরকারি, বেসরকারি চাকরি নেয়ার মেধার ভিত্তিতে। দূতাবাস ও তার কর্মকর্তাদের বলা যায় গরিব দেশের রাজপুত্র।

পাচ. মেধা

আমরা মেধাহীন অদক্ষ। শুধু জানটা নিয়ে আমরা আসি বিদেশে। সিংগাপুরে অদক্ষ লোকটিকে ঘষেমেজে, ট্রেনিং দিয়ে সিআইটি–তে পাঠায় পরীক্ষার জন্য। শতকরা সত্তরজন বাংলাদেশি পাস করে। দক্ষতার সার্টিফিকেট দেয়। এ দক্ষতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তিতে কাজ করার জন্য। বলাই বাহুল্য, বাংলাদেশিদের এ কাজে প্রশংসিত। এখানে আমরা যা শিখলাম তা যে দেশে গিয়ে কাজে লাগাবো সে সুযোগ নেই। কারণ সরকার জানে না আমরা কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছি। তাই যায়যায়দিনের মাধ্যমে সরকারের কাছে প্রস্তাব

রাখছি। এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে যেন একটি ফরম দেয় যা আমরা ফেরার পথে আমাদেরকে দেন। যা বাড়িতে গিয়ে পূরণ করে প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের কাছে ফেরত পাঠাবো। তারা ফাইল করে রাখবে। প্রয়োজন মনে করলে কাউকে ডাকবে। ফরমে থাকবে কি কাজ করেছি, কি অভিজ্ঞতা আছে ইত্যাদি।

ছয়. বিদেশ মন্ত্রণালয়

বর্তমান সরকারের একটি প্রশংসনীয় কাজ প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এটা যে হয়েছে শুনেছি, পত্রিকায় পড়েছি। কিন্তু বাস্তবে এখানো টের পাচ্ছি না। আমরা যাতে টের পাই সে ব্যবস্থা করতে হবে।

সাত. ক্ষতিপূরণ

বিদেশে অনেকেই আহত হন। যৎসামান্য ক্ষতিপূরণ পান। থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, শ্রীলংকা, ফিলিপিনোদের জন্য রয়েছে স্বদেশে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা যা ফেরার পথে ইমিগ্রেশন থেকে ফরম নিয়ে পূরণ করে থাকে। আমাদের জন্য নেই অথচ বিদেশে আসার সময় ইনশিওরেন্স–এর নামে এজেন্টরা টাকা বাড়তি রাখে। কোথায় সেই ইনশিওরেন্স?

আট. লাশ

লাশ এবং কান্না সমার্থক। শ্রীকান্তের *দেবদাস*–এর মতো প্রিয়জনহীন এই প্রবাসে যে সকল হতভাগ্যদের মৃত্যু এবং অপমৃত্যু হয় তাদের পরিবার–পরিজনদের যে কি নিদারুণ অবস্থা হয় তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানে। আমার দেড় যুগের প্রবাস জীবনে কতো লাশ যে বহন করেছি ১৯৯১–এর যুদ্ধে সহকর্মীর স্বাভাবিক–অস্বাভাবিক মৃত্যু, দুর্ঘটনায় মৃত্যু, মালিকের অত্যাচারে মৃত্যু এমনি আরো অসংখ্য মৃত্যু ও লাশের নীরব সাক্ষী আমি। আমাদের রাজকীয় দূতাবাস অন্তত হতভাগ্যদের লাশ সরকারি টাকায় বহন করে পরিবারের কাছে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব নেবে কবে?

সিংগাপুর থেকে

প্রতারিত

বিয়ের স্বপ্ন কোন মেয়ে দেখে না? অন্য দশটা মেয়ের মতো একটু দেরিতে হলেও আমার জীবনে সেই সময়টি এলো। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স শেষ করে একটা ভালো চাকরি করে যাচ্ছি। সেই সময়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর ড. এন.কে. চৌধুরী নিয়ে এলেন আমার জন্য এই বিয়ের প্রস্তাব। এই প্রফেসর ভদ্রলোকটি আমাদের আত্মীয় না হলেও বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ছেলেটি অর্থাৎ পাত্র এবং তার পরিবার সম্পর্কে যে আকর্ষণীয় বায়োডাটা আমাদের কাছে তুলে ধরেছিলেন তার কথাকে অবিশ্বাস করতে পারেনি আমার পরিবার ও আত্মীয়স্বজনরা।

পাত্র বাহাউদ্দিন লতিফ, ঠিকানা বস্টন ম্যানর রোড, লন্ডন ইত্যাদি। ডাক নাম বাবুল।

সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নিয়েছি। সকলে না হলেও অনেকেই আমাদের চেনে এবং সম্মানের চোখে দেখে। এক দেখাতেই পছন্দ করলো পাত্রপক্ষ আমাকে। এনগেজমেন্টের বদলে আকদ পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল তারা। এই অল্প সময়ের মধ্যে যতোটুকু খোজ নেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল আমরা তা নিলাম। বিয়ে হয়ে গেল আমার ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

আমাদের পরিবারের মেয়েদের বাইরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়া এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। তাই তাদের সিদ্ধান্তে আমরা রাজি হলাম। এই আকদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছেলের বাবা–মা, খালা–খালু, মামা–মামি এবং পাত্র নিজে। তাছাড়া ঘটক পরিবার। আরো ছিল আমাদের কাছের আত্মীয়রা।

আমার শ্বশুর আবদুল লতিফ, শ্বাশুড়ি, ননদ, দেবর স্বামী এবং এরা সবাই বৃটিশ নাগরিক। অনেক বছর যাবৎ তারা লন্ডনে থাকেন। ঢাকার উত্তরাতে নিজেদের বাড়ি আছে। ঢাকায় এলে উত্তরার বাসাতেই থাকেন। আকদের অনুষ্ঠানের পর তারা হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিলেন আমাকে তখনই উত্তরার বাড়িতে নিয়ে যাবার। প্রথম দিকে আমার বাবা–মা রাজি না হলেও পরবর্তীকালে ঘটক ও পাত্রপক্ষের চাপের জন্য রাজি হলেন আমাকে সেই রাতে তাদের সঙ্গে দিয়ে দিতে। আমাকে উত্তরার বাসায় নিয়ে যাওয়া হলো। এর ঠিক নয় দশ ঘণ্টা পর আমার স্বামী বাবুল লন্ডনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়লো একাই। আমাকে রেখে গেল আমার শ্বশুর–শাশুড়ির কাছে। আমি যেহেতু চাকরি করতাম সেহেতু বাবা–মায়ের বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে চলে আসতে হতো। বড় একটা অনুষ্ঠান হবে, লন্ডন থেকে বাবুল আসবে, আমরা সবাই এক সঙ্গে ফিরবো এই তাদের প্ল্যান।

এরপর তিন মাস পর বাবুল ঢাকায় এলো। বেশ ধুমধাম করে অনুষ্ঠান হলো। এবারে আমার স্বামী থাকলো পনেরো ষোল দিন। আমার ভিসা হলো। কিন্তু এবারেও সে আমাকে সঙ্গে নিল না। বললো, শ্বশুর–শাশুড়ির সঙ্গে যাবো।

মাস খানেক পর শুনলাম আমার শ্বশুর–শাশুড়িও চলে যাচ্ছেন লন্ডনে এবং তারা গিয়ে আমার যাবার টিকেট পাঠাবেন। কিন্তু তারা পৌছে কিছুদিন পর জানালেন যে, আমার জন্য কোনো টিকেট পাচ্ছেন না। অবশেষে আগস্টের প্রথম সপ্তাহে নিজেই টাকা দিয়ে এখান থেকে টিকেট করে লন্ডনে রওনা হলাম। বাবুলসহ আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই আমাকে নিতে এলো এয়ারপোর্টে।

শুরু হলো লন্ডনে আমার সংসার জীবন। বিদেশে নানান রকম সুবিধা–অসুবিধার মধ্যে দিয়ে নিজেকে তৈরি করছিলাম। লন্ডন আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত শহর। কোথাও একা যেতে পারতাম না। বাবুল আমাকে কোথাও নিয়ে যেতো না। প্রায়ই কাজের নাম করে রাত করে বাড়ি আসতো। আস্তে আস্তে বুঝলাম, যতোভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যাপারগুলোতে স্বামীর ওপর নির্ভর করা যায়, আসলে সেই ব্যক্তি বাবুল নয়। শারীরিক সম্পর্কে সে আমাকে বঞ্চিত করলো। মাঝে মধ্যে মনে হতো অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। ধীরে ধীরে টের পেলাম, যে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও চাকরির পদমর্যাদার কথা বলে আমাদের বিয়ে হয়েছে তার সবটাই মিথ্যা। বাবুলের অন্যান্য ভাই–বোনদের অনেক ঘটনাই আমাদের কাছে লুকানো হয়েছে। মাঝে মধ্যে কোথায় চাকরি করে জানতে চাইলে ভীষণ ক্ষেপে যেতো। কাজের জায়গার কোনো ঠিকানা, এমন কি টেলিফোন নাম্বার পর্যন্তও দিতে চাইতো না। প্রায়ই রাত করে বাড়ি ফেরা, কথায় কথায় গালি দেয়া আস্তে আস্তে অভ্যাসে পরিণত হচ্ছিল।

আমার পরিবারের সঙ্গে তার মেশার সুযোগই হয়নি এতো অল্প সময়ের মধ্যে। অথচ তাদের নিয়ে আজে বাজে কথা বলতো। মাঝে মধ্যে মনে হতো, সে একজন মানসিক রোগী। আবার ভাবতাম, হয়তো তার রাগ বেশি, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। মাঝে মধ্যে রাগ করে বাসা থেকে বের করে দিতে চাইতো আমাকে। শ্বশুর–শাশুড়িকে জানালে তারা তেমন কিছু বলতেন না ছেলেকে। মনে হতো এরা সব জেনেশুনেই আমার মতো মেয়ের সঙ্গে এই ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। নিজের ভদ্র পরিবারের শিক্ষা নিয়ে আস্তে আস্তে খাপখাওয়ানোর চেষ্টা করলাম। তারা আমাকে হাত খরচের টাকা পর্যন্ত তেমন দিতো না। বিদেশে আমার কোনো আয় নেই, আমার চলতে বেশ কষ্ট হতো। আবার আমি কোনো চাকরি করি সেটাও তারা চাইতো না। অথচ এরা ভালোভাবেই জানতো, আমি একজন শিক্ষিত ও চাকরিজীবী মেয়ে। বিয়ের আগে কথা হয়েছিল বিয়ের পর আমি চাকরি অথবা আরো পড়াশোনা করবো।

বুঝলাম ঘরে বসে থাকলে আমার চলবে না। ভর্তি হলাম কয়েকটা ফৃ কোর্সে। এদিকে মাঝে মধ্যে কথা হতো ঢাকায় বাবা–মা, বোন–ভাইয়ের সঙ্গে। বাবুলকে নিয়ে ঢাকায় বেড়াতে যাবার জন্য বলতো আমার পরিবারের সবাই। কাজের চাপের কথা বলে খুব একটা উৎসাহ দেখাতো না সে। আমাকে ঘুরে আসার কথা বলতো। কিছুদিন পর মার্চের দশ এগারো তারিখের দিকে সে আমাকে জানালো সামার ভ্যাকেশন কাটানোর জন্য দেশে যাবার ব্যাপারে। আমি বাবা–মাকে জানালাম। এর চার পাচ দিন পর আমার দেবর টিকেট করলো। শ্বশুর–শাশুড়ি এবং বাবুল আমাকে এয়ারপোর্টে দিতে এলো। দুই মাস পর বাবুল এসে আমাকে নিয়ে যাবে বলে জানালো। আমি খুশি মনে প্লেনে উঠলাম।

প্লেনে বসে খেয়াল করলাম, তারা আমাকে ওয়ানওয়ে টিকেট কেটে দেশে পাঠাচ্ছে। ভাবলাম, বাবুল ঢাকায় আসবে তখন হয়তো আমার যাবার টিকেট নতুন করে করা হবে। ঢাকায় পৌছানোর পর শ্বশুর–শাশুড়ি, বাবুল আমার পৌছানোর কোনো খবর নিল না। তারপর বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। অনেক অপেক্ষার পর কোনো ফোনই তারা করলো না।

আমি যোগাযোগ করলাম নিজে থেকে। শুনলাম আমি ঢাকায় আসার তিন চার দিন পর বাবুল টিউনিশিয়া গিয়েছে বেড়াতে। এদিকে আমার ভিসা শেষ হতে আর মাত্র দুই মাস বাকি ভেবে লন্ডনে বাবুলের কাছে ফোন করলাম। জানালাম সব কিছু। জানতে চাইলাম তার আসার ব্যাপারে। সে জানালো, তার পক্ষে এখন ঢাকায় আসা সম্ভব নয়। তার কথাবার্তাও যেন একটু অন্য রকম মনে হলো। যোগাযোগ করতে চাইলাম প্রফেসর ড. চৌধুরীর কাছে। তারা তো আমাদের এই ব্যাপারে কোনো রকম সাহায্য করলো না, বরং বেশ কিছু উল্টাপাল্টা কথা শোনালো আমার বাবা–মাকে। তারপর ঢাকার অন্য আত্মীয়স্বজন যারা আছে তাদেরও তেমন কোনো বক্তব্য পাওয়া গেল না। অথচ এরা সবাই উপস্থিত ছিলেন আমার বিয়ের সব কয়টা অনুষ্ঠানে।

অবশেষে নিজেই যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। টিকেট করে রওনা হলাম মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। চিন্তা ছিল – *এক.* অসমাপ্ত কোর্স, *দুই.* ভিসার মেয়াদ শেষ হতে আর মাত্র এক মাস বাকি।

লন্ডন এয়ারপোর্টে নামার পর এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন আমাকে আটকালো। তাদের কাছে নাকি খবর আছে আমার ও বাবুলের মধ্যে সেপারেশন চলছে এবং আমার ভিসা ক্যানসেল করা হয়েছে। ফলে ইমিগ্রেশন আমাকে ঢুকতে দেবে না। আমার মাথার ওপর বাজ পড়লো। সরে গেল পায়ের নিচের মাটি। ইমিগ্রেশনকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এবং বললাম, আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমার শ্বশুর–শাশুড়ি, স্বামী এরা কেউই আমাকে এ ব্যাপারে কিছু জানায়নি। লন্ডন এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন দেখাতে পারেনি আমাকে এর কোনো উপযুক্ত প্রমাণ বা কাগজপত্র। শুধু তাদের মুখের কথার ওপর নির্ভর করতে হলো আমাকে। ওয়ানওয়ে টিকেট ছিল বলে হয়তো তারা আমার দেশে ফেরার দায়িত্ব ও সমস্ত খরচ বহন করবে বলে আশ্বাস দিল। আমার পাসপোর্ট রেখে দিল। তারা আমাকে আরো জানালো আমি যদি অ্যাপিল করতে চাই তাহলে তা করতে পারি এবং অ্যাপিল ফরম আমাকে দিল।

আমি এক দূরসম্পর্কীয় চাচাকে ফোন করে এয়ারপোর্টে আনালাম। ছয় দিনের এন্ট্ ভিসা আমার চাচার কাছে ইমিগ্রেশন অফিসার আমাকে হ্যান্ডওভার করলো। পরে ফোন করে জানালো, আমার দেশে ফেরার টিকেট রেডি আছে। এর মধ্যে কয়েকজন উকিলের পরামর্শ নিই। কিন্তু তারা আমাকে দেশে ফিরে যাবার উপদেশ দেয়। এদিকে ইমিগ্রেশনের কথামতো দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিই। তবে তারা আমাকে নির্ধারিত সময় আমার হাতে টিকেট দিতে পারেনি বলে সেই ফ্লাইট মিস করি। তারপরের ফ্লাইটটিতে যদিও আমি রওনা হয়েছি তবুও পথে বেশ অপদস্থ হতে হয় আমাকে। একদিকে আমার জীবনের অনিশ্চিত অবস্থা, অন্যদিকে ইমিগ্রেশনের এই সংকট আমাকে পাগল করে তোলে। বহু কষ্টে ঢাকায় এসে পৌছাই এই বছরের ১৬ মে।

বুঝলাম এই সংসার আমার হলো না। আমার স্বামী আমাকে চায় না।

এতো ঘটনা যে করতে পারে তার পক্ষ থেকেই ডিভোর্স আসা উচিত বলে জানালাম আমার বিয়ের ঘটক ড. চৌধুরীকে। জানালাম শ্বশুরবাড়ির ঢাকায় থাকা অন্য আত্মীয়স্বজনদের। এরা কেউই এ ব্যাপারটিতে আমাকে কোনো রকম পদক্ষেপ নেয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারলো না।

বুঝলাম সে আমাকে ডিভোর্স দেবে না। কেননা তাতে অন্যের চোখে হেয় হয়ে যাবে। হয়তো দিতে হবে কাবিনের টাকা। অন্তত বলতে পারবে, আমি তো ডিভোর্স দিইনি। তাই অনেক চিন্তা করে দেখলাম, কোনো দোষ ছাড়াই যে এ রকম কাণ্ড করতে পারে তার সঙ্গে অন্তত ঘর করা চলে না। এরপর নিজ সিদ্ধান্তে তাকে ডিভোর্স দিলাম।

আজ আমার প্রশ্ন তাদের কাছে যারা এয়ারপোর্টে উকিল ইত্যাদির সাহায্য নেয়ার বুদ্ধি দেয়, আমার মতো মেয়েদের দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করে রাখে, তারা আর কতোদিন এই অন্যায় কাজের জন্য বাবুলের মতো প্রবাসীদের পক্ষপাতিত্ব করে যাবে? যারা আমাকে উপযুক্ত কাগজপত্র প্রমাণ হিসেবে দেখাতে পারেনি তাদের মুখের কথাকে বিশ্বাস করি কেমন করে? তাদের কি উচিত ছিল না, বাবুলকে আমার মুখোমুখি করানো? পরবর্তীকালে তাদের দেশের নাগরিককে তার কর্মকাণ্ডের জন্য কৈফিয়ত দেয়া?

কেন সে আমার এতো বড় সর্বনাশ করলো? কেন আমাকে নিয়ে তারা একতরফা খেলা খেললো?

বৃটিশ সরকার কি উত্তর দেবে?

ফিরে এসে চিঠি দিলাম বৃটিশ হাই কমিশন বাংলাদেশের অফিসে। জানিয়েছি সব কিছু। তারাও খুব সুন্দরভাবে এড়িয়ে গেল। বাচিয়ে দিল তাদের দেশের নাগরিকদের।

সবশেষে আমাদের দেশের প্রতিটি বাবা-মা, অভিভাবকদের সাবধান করতে চাই তারা যেন বিদেশে বসবাসরত পাত্রপাত্রীর সঙ্গে বিয়ে দেয়ার আগে ভালোভাবে খোজ নেন। কোনো ঘটকের মিষ্টি কথায় ভুলবেন না – সেই ঘটক শিক্ষিত, পিএইচডিধারী ইউনিভার্সিটি প্রফেসর হলেও।

অন্যের কথাকে বিশ্বাস করে আমার মতো সর্বনাশ যেন আর কোনো মেয়ের জীবনে না ঘটে।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

কুয়েতের যন্ত্রণা

– ইসমাইল হোসেন

কুয়েতে বর্তমানে প্রায় এক লাখ ষাট হাজারেরও বেশি শ্রমিক বিভিন্ন পেশায় কর্মরত। বাংলাদেশের চরম দারিদ্র, অর্থনৈতিক সমস্যা ও বেকারত্বের কারণে কল্পনা এবং স্বপ্নের রঙিন জাল বুনতে বুনতে বাংলাদেশের মানুষ বিদেশ আসে এক বুক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে। সোনার বাংলার সোনার ছেলেরা জমি-জমা, ঘর-বাড়ি, ভিটে-মাটি বিক্রি করে সহায়-সম্বল হারিয়ে নগদ দেড় থেকে দুই লাখ টাকা আদম ব্যাপারীর হাতে তুলে দিয়ে বিদেশ আসে সোনার হরিণের আশায়।

এখানে আসার পর বিভিন্ন জটিল সমস্যা ও কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে প্রবাসীদের সমস্ত আশা ও স্বপ্ন ভেঙে খান খান, চুরমার হয়ে যায়।

আদম ব্যাপারীদের মিথ্যা আশ্বাস ও গালভরা বুলিতে বিদেশে এসে লাখ লাখ লোকের সোনার সংসারে অশান্তি ও দুঃখ-কষ্ট নেমে এসেছে।

গত তিন বছর যাবৎ কুয়েতে বাংলাদেশের ভিসা বন্ধ ছিল। কুয়েতে ক্লিনিং কম্পানির মালিকেরা বিশ্বের আর কোনো দেশে কম দামে শস্তায় লোক না পেয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় সরকারের অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশের অসৎ, অসাধু, আদম ব্যাপারীদের সহযোগিতায় দেড় বছর যাবৎ বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আমদানি শুরু করে। অথচ শুধু ক্লিনিং কম্পানির ভিসা ছাড়া বাংলাদেশের জন্য প্রাইভেট কম্পানির ভিসা আজও চালু হয়নি। কুয়েতে

বসবাসরত বাংলাদেশের অসৎ মুনাফালোভী আদম ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের শ্রমবাজারের বারোটা বাজিয়েছে।

ষোল দিনার বেতন, বাংলাদেশি দুই হাজার টাকা বা আড়াই হাজার টাকা, বেতনে দেড় থেকে দুই লাখ টাকার বিনিময়ে বর্তমানে কুয়েতে পাইকারি হারে শ্রমিক রফতানি করছে।

একমাত্র বাংলাদেশের মতো এতো কম বেতনে, এতো বেশি টাকা খরচ করে বিশ্বের আর কোনো দেশের লোক এ দেশে আসে না। এ জন্য বিভিন্ন দেশের মানুষ আমাদেরকে অবহেলা ও ঘৃণা করে।

এ দেশের কর্মরত শকরা ৭০ থেকে ৮০% লোক নিম্ন বেতনে বিভিন্ন ক্লিনিং কম্পানিতে কর্মরত। ক্লিনিং কম্পানিতে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর মালিকের জোর-জুলুম, অন্যায়-অত্যাচার-নির্যাতনের কথা লিখে শেষ করা যাবে না।

কুয়েতের একটি বড় ক্লিনিং কম্পানি অয়েল আল-নসীব-এ আট দশ হাজার শ্রমিক চার পাচ মাস যাবৎ বেতন না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে, দেশে তাদের পরিবার-পরিজন অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। এ রকম আরো অসংখ্য কম্পানি আছে যারা মাসের পর মাস নিয়মিত বেতন দেয় না।

কম বেতনে চাকরি ও নিয়মিত বেতন না পাওয়ার কারণে কিছু কিছু পুরুষ এবং মহিলা শ্রমিক অন্যায় ও অবৈধ কাজে লিপ্ত হচ্ছে, কম্পানি থেকে অনেক শ্রমিক পালিয়ে যাচ্ছে এবং পুলিশের হাতে হয়রানি ও নির্যাতন ভোগ করছে।

আগে কোনো প্রাইভেট কম্পানির রিলিজ নিয়ে যে কোনো সময় যাওয়া যেতো, বর্তমানে সরকারি আইনে ক্লিনিং কম্পানি পাচ বছরের আগে রিলিজ দেয় না।

প্রবাসীদের সমস্যা নিয়ে হাজারো লেখালেখি হচ্ছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের টনক নড়ছে না।

এসব ব্যাপারে বাংলাদেশ দূতাবাসে অভিযোগ করলে কোনো লাভ হয় না, দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত ও কর্মকর্তা, কর্মচারীরা যার যার আখের গোছানোর কাজে ব্যস্ত।

প্রবাসীরা দেশে অর্থ পাঠিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরাট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

যে মুহূর্তে বিশ্ব ব্যাংক প্রবাসী নাগরিকদেরকে ভিআইপি মর্যাদা দেয়ার আবেদন জানিয়েছে সরকারের কাছে তখন আমরা প্রবাসী নাগরিকরা দেশে-বিদেশে প্রতি মুহূর্তে, জুলুম, নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হচ্ছি।

সাফাত, কুয়েত থেকে

প্রফেসর সালামের যুদ্ধের লজ্জা

– শামসুন্নাহার ইসলাম

শেম অন ইউ, মি. বুশ, শেম অন ইউ – ধিক্কার তোমায়, মি. বুশ, ধিক্কার তোমায়।

২৩ মার্চ ২০০৩-এ ৭৫তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে মাইকেল মুরের উপরের এই উক্তি আমাকে নষ্টালজিক করে তুলেছে। একবিংশ শতকের ঘৃণ্যতম মানবতার বিরুদ্ধে ইরাক যুদ্ধের প্রতিবাদে মাইকেল মুরের এই উক্তি ইতিহাসে একটি মাইল ফলক। তেমনি ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় একটি ঘটনা আমার জীবন ইতিহাসে হয়ে আছে একটি মাইল ফলক।

আমি তখন পদার্থ বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাকিস্তান সরকারের মেধাবৃত্তি নিয়ে লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে পড়াশোনা করছি। পৃথিবীর বিখ্যাত এবং নোবেল প্রাইজের জন্য নমিনেশনপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী পাকিস্তানের নাগরিক প্রফেসর আবদুস সালাম ওই কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

২৫ মার্চ রাতে হানাদার বাহিনী অসহায় জনগণের ওপর হামলা চালালো। সে খবর ছড়িয়ে পড়লো লন্ডনে। আজ থেকে বত্রিশ বছর আগের কথা। তখন সুবিধাজনকভাবে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে এ অঞ্চলের টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না, ই-মেইল যোগাযোগ তো অনেক পরের ঘটনা। চিঠি এবং টেলিগ্রাফ যোগাযোগ যুদ্ধের কারণে সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আমার সকল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

পিতা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, ছোট ভাইয়েরা ছাত্র, যুবক মামা-চাচা সকলের চিন্তায় আমি দিশেহারা। খবরের কাগজ ও টিভির ছবিতে মৃত্যুর দৃশ্যগুলো আমাকে দুশ্চিন্তায় পাগল করে তুললো। আমার গবেষণার কাজ প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত।

সে সময় একদিন কলেজের পাচ তলায় লিফটের জন্য অপেক্ষা করছি এমন সময় প্রফেসর আবদুস সালাম যিনি আগের দিন ইটালি থেকে ফিরেছেন তার অফিসে যাওয়ার পথে আমাকে দেখলেন এবং খানিক বাদে সেক্রেটারি এসে বললো, তিনি আমাকে ডেকেছেন।

বিভাগের শিক্ষক হলেও এতো বড় বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রফেসরের কাছাকাছি যাবার তেমন সুযোগ ছিল না। তিনি ডেকেছেন শুনে দ্বিধান্বিত চিত্তে ঘরে ঢুকতেই বসতে বললেন। প্রথম কথাই বললেন, I am ashamed of what has happened in your country. (তোমার দেশে যা ঘটেছে তার জন্য আমি লজ্জিত)। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। পর মুহূর্তেই চোখের পানি বাধ ভেঙে নেমে এলো।

প্রফেসর সালাম আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন এবং জানতে চাইলেন কোনোভাবে তিনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন কি না।

দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কথা জানালে তার আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সুযোগ ব্যবহার করে ঢাকায় আমার চাচার সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করলেন এবং আমার পিতা-মাতা, ভাই, আত্মীয়স্বজনদের ভালো-মন্দ সব খবর জানতে পারলাম।

এরপরে পাকিস্তান সরকার দুই মাসের মধ্যে আমার বৃত্তি বন্ধ করে দিলে প্রফেসর সালামের সহযোগিতায় বৃটিশ সরকারের বৃত্তি লাভ করতে সক্ষম হই। বিদেশে অবস্থান করেও অনেকভাবে হানাদার বাহিনীর আগ্রাসনের শিকার হয়েছি। সে সময়ের সব ঘটনা, দুঃখ, তিতিক্ষার বিবরণ দেয়া যায় এখানে। কিন্তু আজ একটি ছোট দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বত্রিশ বছর জীবন যাপন করে এ উপলব্ধি হয়েছে যে, স্বাধীনতা অমূল্য সম্পদ।

বর্তমানে আরেকটি স্বাধীন দেশ ইরাক আক্রমণ করে এবং দখল করে বিদেশি পরাশক্তি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেই বিভীষিকাময় নয় মাসের পুরনো ক্ষতকে আবার রক্তাক্ত করে দিল। টিভি, খবরের কাগজে ছবিগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সে সময় লন্ডনে থাকাকালে আমার দেশের এ জাতীয় ছবিগুলো আমাকে কিভাবে কাদিয়েছে।

আজ আমেরিকার কুখ্যাত প্রেসিডেন্ট বুশ সেদিনকার কুখ্যাত ইয়াহিয়া খানের ভূমিকায় নেমেছে। আমেরিকার অস্কার বিজয়ী মহাপুরুষ মাইকেল মুর আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন নোবেল বিজয়ী সেদিনের পাকিস্তানের বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালামকে। আজকের মাইকেল মুর স্বৈরাচারী বুশকে ধিক্কার দিচ্ছেন। সেদিনের বিজ্ঞানী সালাম তার দেশের মিলিটারি স্বৈরশাসকের আগ্রাসনের শিকার তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের এক নগন্য ছাত্রীর কাছে তার লজ্জা স্বীকার করেছেন। যুগে যুগে মহাপুরুষেরা ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য তাদের চিন্তা-চেতনাকে উজ্জীবিত রাখুন, জয় হোক মানবতার।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে

তামিল সন্ত্রাসী

– এস. এম খাদেমুল বাশার

পড়ালেখা শেষ করে দেশে চলমান বেকারত্বের অভিশাপ ঘোচাতে উন্নত জীবন আর অধিক উপার্জনের আশায় ১৯৯৬ সালের জুনে পাড়ি জমালাম মালয়শিয়ায়। ন্যাশনাল প্যানাসনিক কম্পানিতে চাকরি নিয়ে মোটামুটি নতুন পরিবেশ এবং কঠোর নিয়ম–কানুনের মধ্যে জীবনের প্রথম প্রবাস জীবন ভালোই কাটছিল। মালয়শিয়ানরা শান্ত জাতি। ইমিগ্রান্টদের মধ্যে চায়নিজরা বাংলাদেশিদের ভালোবাসে এবং সহযোগিতা করে। কিন্তু ইনডিয়ান তামিলরা খুবই হিংস্র। এ তামিলদের নিয়েই আমার লেখার অবতারণা।

রাজধানী কুয়ালা লামপুরের উপকন্ঠে ছিল আমাদের হস্টেল। একদিন রাতে বাসায় ফিরছিলাম। হঠাৎ পেছন দিক থেকে একটি প্রাইভেট কারযোগে তিনজন সশস্ত্র তামিল আমার গতি রোধ করে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে গেল এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে। আমার কাছে যা ছিল রিংগিট, ঘড়ি, ক্যামেল বুট, এমনকি জিন্স প্যান্টটিও খুলে নিল। আমি হয়ে গেলাম দিগম্বর।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়, এরপর তারা আমাকে বললো, *কিতা বিঞ্চি ওরাং বাংলা* (আমার বাংলা লোকেদের ঘৃণা করি)। *কিতা মাহ বুনো কামু* (আমরা তোমাকে হত্যা করবো)।

ঠিক তখন আমার শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল সম্ভাব্য মৃত্যুর পরিণতির কথা ভেবে। কারণ তারা আমাকে মাটিতে শোয়ানো অবস্থায় গলায় চাকু ধরে পোচ দেবে এমন ত্রাহি অবস্থায় শুধু মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করছি এবং কলেমা পড়ছিলাম বেশি করে। এমন অবস্থায় তাদের একজন আমার বুকে লাথি দিয়ে বললো, *পুকিমা বাংলা* (বাংলার মারে...)।

ঠিক তখনই আমার হিম শরীরে উত্তাপ এসে গেল এবং তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ ফিল্মি স্টাইলে সজোরে উঠে প্রচণ্ড লাথি এবং ঘুষি সহকারে তাদের কাবু করে দিগম্বর অবস্থায় দৌড়ে পাহাড় থেকে নেমে এলাম রাস্তায়। তখন এক মালয়শিয়ান ভাইয়ের সহায়তায় বাসায় পৌছে নতুন জীবন ফিরে পেলাম।

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, মরে যাচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ করে যখনই আমার দেশ, আমার বাংলা মাকে গালি দিল *পুকিমা বাংলা* বলে তখন বাংলা মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে আল্লাহপাক আমায় নতুন জীবন দিল। কারণ দেশপ্রেম কি জিনিস তা প্রবাসে গেলে বোঝা যায়।

এই হিংস্র তামিলদের হাতে অগণিত প্রবাসী বাঙালি শ্রমিকভাইয়েরা প্রতিদিনই কোনো না কোনোভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে। আবার অনেককে তারা মেরে ফেলেছে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে। আইনের আশ্রয় নিয়েও সুবিচার পাওয়া যায় না। কারণ তাদের ভাষায় আমরা *ওরাং আসিং* (বিদেশি লোক)।

আমাদের আবেদন, মালয়শিয়াসহ সব প্রবাসীভাইদের যারাই প্রবাসে প্রবাসী সন্ত্রাসী দ্বারা আক্রান্ত হবেন তারাই ওই সব হিংস্র পশুদের মোকাবেলা করবেন উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা আর শক্তি দিয়ে। কারণ আমাদের এই সংগ্রাম, জীবন–জীবিকা এবং বাচা–মরার সংগ্রাম।

মাইজদি কোর্ট, নোয়াখালী থেকে

পরদেশ

– মোহাম্মদ মহসীন

আমি যখন বলতাম, অনীক, আমি তো বিদেশে চলে যাবো। তুমি তোমার আম্মুর সঙ্গে থাকবে। তিন বছরের ছেলে আমার তখনই বলতো আমিও যাবো। কখনোই তাকে রাজি করানো যেতো না। সেই ছোট্ট অনীক তখনই হয়তো বুঝতো, আমার আব্বুর বিদেশ যাওয়া মানে অনেক দূরে চলে যাওয়া।

১৯৯৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর এয়ারপোর্টের আনুষঙ্গিকতায় ইমিগ্রেশনের সর্বশেষ ব্যক্তির পাসপোর্ট আটকে দেয়া এবং তারই অন্যায় দাবির কাছে মাত্র বিশ রিয়ালের বিনিময়ে উতরে যাওয়ার মধ্যে দিয়েই শেষ করলাম দেশকে বিদায় জানানোর সর্বশেষ আনুষ্ঠানিকতা। পা দিলাম নতুন সম্ভাবনার নতুন জীবনে অনেক আশা নিয়ে। কিছুক্ষণ আগেও যে ছিল আপন পরিচয়ে পরিচিত সে আজ হয়ে গেল প্রবাসী।

খা খা রোদ্দুর আর গাছ পালাহীন মরুময় এক পাথরের দেশ দেখে সব কিছু অবাক লাগতে লাগলো। এরপর যতো দিন যাচ্ছে ততোই দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা মনে পড়তে লাগলো। সব কিছুর পরে বাস্তবতার কথা ভাবতাম। জীবন সংগ্রামের এ এক সুকঠিন পথচলা!

আমি আসার এক মাস পরে নিজ জেলা বরগুনার মান্নান রানা নামের একটি ছেলে হৃদরোগে মারা গেল। তার মৃতদেহ দেখতে গেলাম। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হসপিটালে বসে থেকেও তাকে সবাই দেখতে অনুমতি পেলাম না। এ ছেলেটাই আমি সউদি আসার পর দেখা করতে এসেছিল কয়েকবার। বলেছিল – অনেক আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, দেশে যাবার কথা, দেশে গিয়ে বিয়ে করবে ইত্যাদি নানান কথা।

শেষ পর্যন্ত তার মৃত লাশটিও টাকার অভাবে দেশে পাঠানো সম্ভব হলো না। আমাদের দেশের সরকার এ জাতীয় সমস্যা দূরীকরণে কোনো উদ্যোগ নিলে ভালো হতো।

মা–বাবা, স্ত্রী–পুত্র, ভাই–বোন, আত্মীয়–স্বজন সবার চিঠি পেতে থাকলাম রীতিমতো। সময়ের ব্যবধানে তা আবার কচ্ছপ গতি হয়ে গেল দেখতে দেখতেই। নিজেও কেমন যেন পাষাণ হয়ে গেলাম। প্রথম দিকে কারো চিঠি পড়তে অঝোর ধারায় চোখের পানি ঝরতো। আস্তে আস্তে তা আবার কমতে লাগলো। মনের ব্যথা মনের অজান্তেই দূরে হারিয়ে যেতে লাগলো। আজ তিন বছর পরে আবার কাদলাম ভাই আনোয়ার হোসেনের যায়যায়দিনে লেখা *লক্ষী বোন* শিরোনামের ছোট্ট একটি লেখা পড়ে।

যেভাবে আছি, যেমন আছি এ নিয়ে অখুশি নই, তবে কোনো কোনোদিন যখন কোনো বাঙালি ভাই করুণ চেহারা নিয়ে রাস্তায় পেপসির খালি ক্যান খুজে বেড়ায় এবং বলে, ভাই একটা রিয়াল দেবেন? পেপসি খেতাম, তখন নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। কাছে ডেকে বলি, ভাই কি কাজ করো?

বলে বলদিয়ার কাজ করি, বেতন আড়াইশ সউদি রিয়াল। ভাই, এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে বিদেশে এসেছি। এখন আসল ওঠাতেই দায়। কি করবো! তাই এটা করছি।

ভাবা যায় না। এ দেশে বিভিন্ন দেশ থেকে লোক আসে কাজ করতে। কিন্তু কেবল বাঙালিরাই এতোটা অসহায় কেন? কেন তাদের বেতন এতোটা কম? অন্য কাউকে তো দেখছি না এতোটা অসহায়ভাবে জীবন কাটাতে। তবে কি আমাদের ব্যবস্থাপনায় কোনো গাফিলতি, নাকি অশিক্ষা আমাদেরকে বাস্তবতা থেকে দূরে রেখেছে?

বাঙালিরা অনেক কম বেতনে কাজ করে বলে বিভিন্ন জাতি আমাদেরকে খাটো চোখে দেখে। এদের মধ্যে ইনডিয়ান কেরালা রাজ্যের লোকেরা এগিয়ে। তাদের সঙ্গে প্রায়ই আমার কথা কাটাকাটি হয়। কিছুদিন আগে রিয়াদ ডেইলি পত্রিকায় এক কেরালাবাসীর ছবি নিয়ে তাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণার সংবাদ দেখে তাদেরকে আচ্ছামতো দুই কথা বলে দিতে দেরি করিনি। তাদেরকে গৌরবের সঙ্গে বলেছিলাম, বাঙালি গরিব

হতে পারে, চোর নয়। তোমাদেরকে অত্যন্ত ধূর্ত হিসেবে সউদিরা জানে। বাঙালিরা সহজ-সরল বলে এদের প্রতি বিশ্বাস অনেক বেশি। দিনে দিনে বাঙালিরা সে বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

অত্যন্ত আশার কথা, সরকার আমাদের জন্য মন্ত্রণালয় গঠন করেছে। সুবিধা-অসুবিধায় সর্বোচ্চ সাহায্য-সহযোগিতা পাবার এ এক মহৎ উদ্যোগ। আমরা যারা প্রবাসী এদের বড় অংশই অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত। সরকারের কাছে সমস্যা তুলে ধরার মতো যোগ্যতা নেই। এ বিষয়ে সরকার আন্তরিক হলে অনেক সমস্যা কবলিত বাঙালি ভাইয়েরা বিপদে সামান্য সহযোগিতা পেয়ে উপকৃত হতে পারে। আমরা যারা বিদেশে আসি এদের ন্যূনতম বেতন দেশে চুক্তিনামা করাই যেন শেষ দেখা না হয়। এখানে আসার পরেও যেন সেটা নিশ্চিতভাবে পেতে পারে তার জন্য কার্যকরী ও সজাগ দৃষ্টি রাখা সরকারের যেন দায়িত্ব থাকে। বিদেশে পাঠিয়ে দিলেই বৈদেশিক মুদ্রায় দেশ ভরে যাবে এ আশা করে আমাদেরকে যেন প্রতারিত না হতে হয়। দেশের স্বজনের মায়া ছেড়ে আমরা অনেক দূরে। উপরওয়ালার পরে আমাদের ভরসা একমাত্র সরকার। কেননা আমরা যে পরদেশে প্রবাসী।

সউদি আরব থেকে

শিক্ষা

– এম.এ মুকসিত

অফিস থেকে ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে জার্মানি যাই। সেখানে বেশ কিছুদিন প্রবাসী হয়ে থাকতে হয়েছিল। সেই প্রবাস জীবনে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম যা কোনো বই পড়ে অর্জন করতে পারতাম না। তারই একটি ছোট্ট, অথচ বিবেক নাড়া দেয়ার মতো সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা আজ লিখবো। যে অভিজ্ঞতা আমার বিবেকের ওপর প্রচণ্ড চপেটাঘাত দিয়েছিল।

ফ্র্যাংকফুর্ট শহর থেকে পয়ত্রিশ কিলোমিটার Seeheim নামের ছোট ছিমছাম রুরাল নরিয়াতে থাকতাম। আমার রুমের পাশের রুমে থাকতো এক কোরিয়ান যার নাম শিন। সে আমার ট্রেনিংমেট হওয়ার সুবাদে আমরা দুইজন বেশি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম।

আমরা প্রায়ই শপিং করার জন্য Seeheim থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে শপিং শহর হিসেবে খ্যাত Darmstadt-এ যেতাম। যেহেতু আমাদের কারোরই কোনো ব্যক্তিগত গাড়ি ছিল না, তাই Darmstadt-এ যাওয়ার একমাত্র বাহন ছিল Strassebahan (Streetrail)।

Seeheim-এরই একটি ছোট্ট স্টেশন New Rathaus থেকে Streetrail-এ করে Darmstadt যেতাম। উল্লেখ্য যে, জার্মানিতে Strassebahan মটর গাড়ি যে রাস্তায় চলে (Autobahn বা Highway ছাড়া) সেই রাস্তারই মাঝ দিয়ে অথবা পাশ দিয়ে লাইনের ওপর দিয়ে চলে। অনেকটা কলকাতা-এর Tram-এর মতো।

একদিন আমি ও শিন Darmstadt যাওয়ার উদ্দেশ্যে New Rathaus স্টেশন গেলাম। টিকেট ভেনডিং মেশিন-এর কাছে গিয়ে দেখি Ausser Betrieb. অর্থাৎ আউট অফ অর্ডার নোটিশ লাগানো। বাটন চাপ দিলে এবং পয়সা না দিলেই টিকেট বেরিয়ে আসে। আমরাও টেক ইট এজ এ ফান (Fun) চিন্তা করে টিকেট নিয়ে নিলাম। কিন্তু পয়সা দিলাম না। New Rathaus থেকে Darmstad যাওয়ার ভাড়া ছিল আড়াই ডয়েশ মার্ক। Strasse Bahn আসতে তখনো সাত মিনিট বাকি।

আমরা টিকেট নিয়ে স্টেশনের এক কোণায় রেলের জন্য অপেক্ষা করছি। ইতিমধ্যে দুটো ছোট ছেলে বয়স আট নয় বছর হবে, দুষ্টুমি করতে করতে টিকেট ভেনডিং মেশিন-এর কাছে গেল। তারাও মেশিন নষ্ট হওয়ার

নোটিশ পড়লো। তারপর বাটন চাপ দিয়ে টিকেট নিল। আমরা দূরে দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছি ও ভাবছি যে, দুষ্টু বালক দুটোও হয়তো আমাদের মতোই দুষ্টুমি করে পয়সা দেবে না।

কিন্তু না, আমাদের ধারণা মিথ্যা করে দিয়ে টিকেট নেয়ার পর পরই দুটো দুষ্টু ছেলেই গুণে গুণে ভাড়ার দাম মেশিনের ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। সেই দৃশ্য দেখার পর আমাদের ফান আর আনন্দ দিতে পারলো না। তা যেন গান (Gun) হয়ে আমাদের বিবেকের ওপর গুলি ছুড়তে লাগলো।

সেই দুষ্টু ছোট বালকদ্বয় আমাদের মতো দুইজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকে যেন বুঝিয়ে দিল কি নিয়ে ফান করতে হয় এবং কি নিয়ে ফান করতে হয় না। আমাদের কাছে যেটা ফান ছিল সেটাই তাদের কাছে ছিল অবশ্য কর্তব্য। ঘরে ফিরে এসে চিন্তা করলাম, কেন জাতি হিসেবে তারা এতো উন্নত!

সেই ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো কাজ করতে গেলেই প্রথমে ভাবি, আমি কি ফান করছি না, সিরিয়াসলি করছি সেই New Rathaus-এর নাম না জানা দুটো বালকের কারণে।

ঢাকা থেকে

সুতা কাটা ঘুড়ি

– এস.এম শিমুল চৌধুরী

মরুভূমির উষ্ণ দহনে থাকার মতো ছেলে আমি ছিলাম না কখনো। অভাব ছিল আমাদের সংসারে। আমি সংসারের বড় ছেলে। তাই ঢাকা শহরের সমস্ত অলি–গলিগুলো পায়ে হেটে চাকরির খোজ করেছিলাম। শুধু একটা চাকরি যা কি না পরিবারটাকে দুঃখের আধার থেকে সুখের আলোয় নিয়ে যাবে। না, অযোগ্য আমি। কর্মখালি নাই এই ব্যানারে ছেয়ে গেছে ঢাকা শহরের কর্মস্থানগুলো। অবশ্য কোথাও পাওয়া যায়। তবে তার মধ্যে মামা–খালু, চাচা থাকা চাই।

অবশেষে এক মহৎ ব্যক্তির সাহায্যে যাত্রা করি মধ্যপ্রাচ্যের দেশে সউদি আরবে। তার নাম পরে বলবো। কাজটা কষ্টের হলেও বেতন ছিল খুবই ভালো। সংসারকে রক্ষা করতে শত কষ্ট করি। মুখ বুজে সহ্য করে প্রবাসী জীবনে পার করি আমার দুটি বছর। বিলাসিতার মুখ দেখে ভুলে যাই তার কথা যে কি না আমাকে এতো দূর আসতে অর্থ, বল আর সাহস দুটোই এক সমানে দিয়েছিল।

দেখতে দেখতে যখন পাচটি বছর কাটলো তখন ছুটিতে দেশে ফিরে আসি। মহাআনন্দ আর সীমাহীন সুখ–সান্নিধ্যে কেটে যায় বেশ। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু–বান্ধব নিয়ে কাটে ছুটির ছয় মাসের এক মাস। এক মাস সাত দিনের মাথায় নিউ মার্কেটে যাই কিছু শপিং করার জন্য। শালিমার শাড়ি হাউসের সামনে দাড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে একটু দূর থেকে চেনাচেনা লাগলো। দ্রুত বেগে পা বাড়ালাম। আমার সঙ্গে ছিল খালাতো ভাই মিশু। মেয়েটির কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনি নিশ্চয়ই চাদনি।

তাকে তখনই চিনেছিলাম। কলেজ জীবনে চুটিয়ে আড্ডা মারার একমাত্র সঙ্গিনী ছিল। অন্য কেউ তার মতো ছিল না। ফলে সমস্ত কলেজ জুড়ে ছিল তার নাম। এমন কোনো ছেলে ছিল না যে তাকে প্রেমপত্র লেখেনি কিংবা তার রূপের গুণ গায়নি। সেই প্রিয় বান্ধবীকে চিনবো না, অসম্ভব!

আমাকে চাদনি চিনতে পেরে আমার সঙ্গে একটু মজা করলো। রীতিমতো মুখের ওপর বলে দিল, আপনি ভুল করছেন, আমার নাম চাদনি নয়, আমার নাম মলি।

আই অ্যাম রিয়ালি ভেরি সরি, বলে পা বাড়াতে চাদনি পেছন থেকে আমার কাধ ধরে বললো, কোথায় যাস শিমুল। আর কেমন দেখালাম বল তো।

অবাক করা চোখ নিয়ে দুইজনে মুচকি হাসি দিলাম। একটা ফাস্ট ফুডের দোকানে গেলাম আমরা তিনজনই। খাবার মানে ফুচকা আর লাচ্ছি এ দুটোতেই চমৎকার সময় কাটালাম। চাদনি তার বাসার ঠিকানা দিয়ে চলে গেল খুব তাড়াতাড়ি। বাসায় ফিরতে আমার এবং মিশুর রাত আটটা বেজে গেল।

চাদনি, রাশেদ, মুনমুন, নাহিয়ান, অনিন্দ, অনি, ফেনসি সব বন্ধুরাই আমার বাসায় আসতো এক সময়ে। চুটিয়ে আড্ডা মারতাম। মায়ের বকুনিতে আড্ডার মজাটাই শেষ হতো। সেই সব স্মৃতিবহুল ঘটনা এখন শুধুই অতীতের মধ্যে কচু পাতার পানি।

ছোট খালা এলেন একদিন আমাদের বাড়িতে। আমার বিয়ের ব্যাপারে বাবা–মাকে সচেতন করে তোলার জন্যই হয়তো বা তার আসা। খালার দেয়া মন্ত্রে বাড়ির সবাই মশগুল।

রাতে খাবার টেবিলে বসতেই বাবা বললেন, যাবার আগে যদি বিয়ে করে যাস তাহলে আমাদের জন্য খুব ভালো হতো।

বাবার এই কথায় লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে রইলো।

পরের দিন মা বললেন, তোর যদি পছন্দের কেউ থাকে তাহলে বল, আমরা তার সঙ্গেই তোর বিয়ে দেবো।

মায়ের কথা ভালোলাগায় চাদনির বাসার ঠিকানাটা মাকে দিই। মা ঠিকানা অনুযায়ী গেলেন এবং দিন তারিখ সব ঠিক করেই তবে বাবার সঙ্গে বাসায় ফিরলেন। চাদনি হঠাৎ এক রাতে আমাকে ফোন করলো এবং তড়িঘড়ি করে কতো কি বলতে চাইলো। কিন্তু তার কথা শোনায় আমার অনাগ্রহ তার জরুরি কথাগুলো বলতে অসুবিধা সৃষ্টি করে। এরপর চাদনি কয়েকবার ফোন করেছে। অবশ্য আমাকে পায়নি। তাও আবার ছদ্ম নামে।

১৩ ফেব্রুয়ারি আমাদের বিয়ে হলো মহাধুমধামে। বন্ধু–বান্ধব, আত্মীয়–স্বজন কারো কোনো কমতি ছিল না। একান্ত সমস্যা না থাকায় নতুন বৌকে নিয়ে ঘোরাফেরায় কাটছিল খুব চমৎকার। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই চাদনিকে নীরব–নিথর মনে হলো। বুঝতে পারলাম না কেন তার নিশ্চুপ থাকা। ছুটি শেষ হওয়ার মাত্র সাত দিন আগেই দেশ ছাড়লাম। সুন্দরী স্ত্রী আর বাবা, মা, ছোট ভাই–বোনের আদর–ভালোবাসার বিসর্জন দিয়ে আবার যাত্রা করলাম মরুভূমির পথে।

মন আনন্দে ভরপুর আবার নিরাশায় অস্থির। কারণ দেশের মাটিতে রেখে আসা আত্মীয়স্বজন এবং স্ত্রীকে ছেড়ে বিদেশের মাটিতে থাকা এখন যেন আমার জন্য বড় কষ্টের হয়ে দাড়িয়েছে। দেখতে দেখতে আবারও দুটি বছর চলে গেল। এরই মধ্যে আমাদের বিয়ের দুটি বছর পার হয়েছে। একবার চাদনি আমাকে শুভেচ্ছা দিয়েছিল। কিন্তু এ বছর দিল না। কর্মব্যস্ততায় যখন নিজেকে আরো বেশি বিলিয়ে দিতে লাগলাম ঠিক সেই সময়টা মায়ের একটি চিঠি এলো আমার কাছে। চিঠিতে লেখা ছিল –

ঢাকা থেকে

বাবা শিমুল,

পত্রলিপিতে আমার ভালোবাসা তোমার জন্য। আশা করি তুমি প্রবাস জীবনে বন্ধু–বান্ধব সবাইকে নিয়ে ভালো আছো। আমরাও এখানে তেমনই আছি যেমনটি তিনি আমাদের রেখেছেন।

যাক, পর সমাচার, তুমি যেভাবে হোক, যে করেই হোক দেশে আসো। অতি এক গুরুতর সমস্যায় আমরা এখন পতিত।

তুমি ছাড়া এ সমস্যার সমাধান করা আমাদের জন্য অসম্ভব।

ইতি – তোমার মা

দেশের মাটিতে পা রাখার জন্য অনেক আগে থেকেই আমার মন ছিল ব্যাকুল। মায়ের এই চিঠি আমাকে আরো বিচলিত করে তুললো। এ মুহূর্তে ছুটি পাওয়া অসম্ভব যদি না চাকরি ছেড়ে দেয়া হয়। এ ব্যাপার নিয়ে প্রবাসী এক বন্ধুর সঙ্গে খোলামেলা আলাপ করি। অবশেষে বন্ধুটির পরামর্শে আমার বস পাকিস্তানি রহমান হোসেনকে পৌনে দেড় লাখ টাকা ঘুস দিয়ে নতুন *আকামা* করে ফিরে আসি দেশে।

দেশে ফিরে শুনতে পাই পরিবারের সবারই কাছ থেকে চাদনির সমালোচনা। মায়ের তীব্র প্রতিবাদ ছিল, প্রেম–ভালোবাসা আগে থাকতেই পারে। তাই বলে বিয়ের পরও সেই সম্পর্ক থাকাটা অনুচিত। আকাশ যেন মাথায় ভেঙে পড়লো প্রেয়সীর সমালোচনা শুনে। বিশ্বাস করতে না চাইলে মা আমার হাতে অনেকগুলো চিঠি দিয়ে বলেন, এই নে বাবা।

এগুলো হাতে নিয়ে ফিরে আসি আমার ঘরে। এক অশান্তময় যন্ত্রণার মুখোমুখি আমি। একটি চিঠিতে লেখাছিল –

৭ ফেব্রুয়ারি

সুপ্রিয়া চাদনি

ভালোবাসার দাবিতে আজ তোমার কাছে আমি একটা জিনিসই চাইবো। তা হলো, আমাকে ভুলে যাও এবং বিয়ে করো আমার বন্ধুকে। এ যদি তুমি করো তাহলে বুঝবো সত্যি তুমি ভালোবাসো আমাকে।

ইতি – রাশেদ

যার জন্য আমি এবং আমার পরিবার সুখময় জীবনে আসতে পেরেছি সে তো আর কেউ নয়। সে তো মহান উদার উৎসর্গের নায়ক আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু রাশেদ। তবুও নিজের স্ত্রী রক্ষা করতে রাশেদের বাসায় যাই। ঝগড়ার মানসিকতা নিয়ে তার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করি। কিন্তু কি আশ্চর্য! সে একটি কথাও বললো না।

শেষে একটি কথা বললো, আমার ভালোবাসাকে আমি তো কোরবানি দিয়েছি। এখন তো আমার ভালোবাসা তোর ঘরনী। তাকে ধরে রাখার দায়িত্ব তোর, আমার নয়।

সত্যিই তো, তাকে দোষারোপ করে লাভ কি? দোষ যা তা তো আমার ভাগ্যে। ফিরে এলাম বাসায়। ফিরে দেখি চাদনি বাসায়। রাতে তুমুল ঝগড়া দুইজনার।

শেষ পর্যন্ত চিন্তা করলাম, সুতা কাটা ঘুড়ি কখনোই নিজের আয়ত্তে আনা যায় না। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, চাদনিকে ডিভোর্স দেবো। এতে করে যদি আমার বন্ধুর জন্য কিছু করা যায়। তা না হলে নিজেই পরাজিত হবো তাদের ভালোবাসার কাছে। এবং তাই করলাম।

ফিরে এলাম আবার প্রবাস জীবনে। এখন অবশ্য আমি মধ্যপ্রাচ্যে নয়। সিঙ্গাপুরের মাটিতে একাকিত্বে। সত্যি আমার মনবাসনা পূর্ণ হয় রাশেদ আর চাদনির জীবন এক সুতায় গাথা হয় বলে।

সুতা কাটা ঘুড়ি ফিরে পেয়েছে তার আকাশের মানুষকে।

সিঙ্গাপুর থেকে

মিনিসোটার বাংলাদেশি

– মোরতোজা আবদুল্লাহ

আমেরিকার পঞ্চাশটি রাজ্যের অন্যতম একটি রাজ্য মিনিসোটা। ভৌগোলিক দিক থেকে আমেরিকার মিড ওয়েস্ট বা মধ্য পশ্চিমে অবস্থিত মিনিসোটা। মিনিসোটা রাজ্যের সঙ্গে কানাডার ম্যানিটোবা রাজ্যের বর্ডার

রয়েছে। এই রাজ্য আয়তনে বাংলাদেশের প্রায় দেড়গুণ। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই রাজ্যের জনসংখ্যা পঞ্চাশ লাখের কিছু কম।

এই রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের বিশেষ একটি মিল রয়েছে। বাংলাদেশে যেমন অসংখ্য নদী–নালা, খাল–বিল রয়েছে তেমনি মিনিসোটা রাজ্যেও রয়েছে দশ হাজার লেক। এই কারণে আমেরিকাতে মিনিসোটা *দশ হাজার লেকের রাজ্য* নামে খ্যাত। এই রাজ্যে চলাচলকারী গাড়ির লাইসেন্স প্লেটে *টেন থাউজেন্ড লেকস* কথাটি লেখা থাকে।

মিনিসোটার রাজধানী হল সেন্টপল এবং সবচেয়ে বড় শহর মিনিয়াপলিস। সেন্টপল এবং মিনিয়াপলিস একেবারে পাশাপাশি অবস্থিত হওয়ায় এ দুই শহরকে *টুইন সিটিজ* বা *যমজ শহর* বলা হয়ে থাকে। সমগ্র আমেরিকাতে একটিই মাত্র টুইন সিটিজ বা যমজ শহর রয়েছে এবং সেটিই হলো মিনিয়াপলিস সেন্টপল।

নব্বই দশকের শুরু থেকে মিনিসোটা রাজ্যে অনেক বাংলাদেশির আগমন ঘটে। ইমিগ্রান্ট ভিসা ছাড়াও ছাত্র ভিসায় অনেক বাংলাদেশি মিনিসোটাতে আসতে শুরু করে। ভালো মানসম্পন্ন বেশ কতোগুলো ইউনিভার্সিটি রয়েছে এই রাজ্যে। সরকারি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার খরচও বেশ কম। এ কারণে নব্বই দশকের শুরু থেকে কয়েক হাজার বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রী এই রাজ্যের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসে। তবে সেপ্টেম্বর ইলেভেন এবং তার পরবর্তী সময়ের অর্থনৈতিক মন্দার বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশি ছাত্রদের ওপর বিশেষভাবে পড়তে থাকে। তার ওপর বাংলাদেশিদের জন্য নতুন রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম অনেকটা মরার ওপর খাড়ার ঘা পড়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশ থেকে আসা প্রায় সব ছাত্রছাত্রীই সঙ্গত কারণে দেশ থেকে পয়সা নিয়ে এসে পড়াশোনা করতে পারে না। সে কারণে তাদেরকে এখানেই টাকা–পয়সা কামাই করে পড়াশোনা করতে হয়। মিনিসোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের অধীনে সাতটি ইউনিভার্সিটি রয়েছে। এ সাতটি ইউনিভার্সিটি হলো – মিনিসোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি মেনকেটো, মিনিসোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি মুরহেড, উইনোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি, সাউথওয়েস্ট স্টেট ইউনিভার্সিটি, বেমিডজি স্টেট ইউনিভার্সিটি, মেট্রোপলিটন স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং সেন্ট ক্লাউড স্টেট ইউনিভার্সিটি। এই ইউনিভার্সিটিগুলোর প্রায় প্রতিটিতেই বাৎসরিক চার পাচ হাজার ডলার টিউশন ফি দিয়ে পড়াশোনা করা যায়।

স্টুডেন্ট ভিসায় আসা ছাত্রছাত্রীদের ওপর নানান রকম বিধি–নিষেধ আছে। যেমন ইউনিভার্সিটি চলাকালে ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসের ভেতরে কিংবা বাইরে সর্বোচ্চ বিশ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারে না এবং ক্যাম্পাসের বাইরে কাজ করতে হলে আইএনএস বা ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ওয়ার্ক পারমিট নিতে হয়। এছাড়াও প্রতি সেমিস্টারে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্লাস সমাপ্ত করার নিয়মও আছে। তবে প্রয়োজনের তাগিদে অনেকে অনুমতি ছাড়াই ক্যাম্পাসের বাইরে কাজ করে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের পয়সার উৎস মূলত দুটি। *এক.* ক্যাম্পাসের ভেতরে কিংবা বাইরে কাজ করা। এবং *দুই.* ক্রেডিট কার্ড থেকে টাকা নিয়ে টিউশন ফি দেয়া। মিনিসোটা রাজ্যে অসংখ্য ইনডাসট্রি থাকায় কাজ পেতে কোনো অসুবিধা হয় না। এই দুটি উৎস থেকে টাকা নিয়ে অনায়াসে পড়াশোনা শেষ করা যায়। তবে সেপ্টেম্বর ইলেভেনের ঘটনা সব কিছুই একেবারে ওলোট–পালোট করে দিয়েছে।

সেপ্টেম্বর ইলেভেনের ঘটনার মূল হোতাদের অনেকেই আমেরিকাতে স্টুডেন্ট ভিসায় অবস্থান করছিল। ফলে পরবর্তী কালে আমেরিকার সরকার প্রতিটা স্টুডেন্টকে ট্র্যাক করার সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়াও আইএনএস ভিসা ভায়োলেটরদের প্রতি জিরো টলারেন্স পলিসি নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ কেউ কখনো ইমিগ্রেশন আইন ভঙ্গ করতে গিয়ে ধরা পড়লে তাকে জেলজরিমানা এবং দেশ থেকে বহিষ্কারের সম্মুখীন হতে হবে। ইতিমধ্যেই

হাজার হাজার লোককে বহিষ্কার করা হয়েছে। আইন কড়াকড়ি করার ফলে বাংলাদেশিরা বিশেষভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। আগের মতো আর নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারছে না।

আমেরিকাতে চাকরি করতে হলে প্রতিটা অ্যাপ্লিকেন্টকেই বাধ্যতামূলকভাবে দুই তিনটা ফরম পূরণ করতে হয় এবং দুই প্রকার আইডেন্টিফিকেশন দেখাতে হয়। সাধারণত সবাই সোশাল সিকিউরিটি কার্ড এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখিয়ে থাকে। আগে সবাইকে একই মেয়াদের এবং একই রকম ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়া হতো। কিন্তু সেপ্টেম্বর ইলেভেনের পর থেকে মিনিসোটাসহ অন্যান্য আরো কয়েকটি রাজ্যে যারা ননইমিগ্রান্ট ভিসায় আছেন তাদেরকে শুধু ভিসার মেয়াদ যতোদিন আছে ততোদিনের জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে। এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সের ওপর স্টেটাস চেকড কথাটি লিখে দেয়া হচ্ছে যাতে শুধু লাইসেন্স দেখেই একজনকে বিদেশি হিসেবে শনাক্ত করা যায়। এর ফলে শুধু লাইসেন্স দেখিয়ে বাইরে কাজ করাটা অনেকটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর ভিসা না থাকলে তো লাইসেন্সই পাওয়া যাবে না। তার ওপর আবার কিছুদিন আগে ননইমিগ্রান্ট বাংলাদেশিদেরকে প্রতি বছর রেজিস্ট্রেশন করার আইন করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি বছর লোকাল আইএনএস অফিসে হাজির হয়ে ফিংগার পৃন্ট দিয়ে আমেরিকায় থাকার বৈধ কাগজপত্র দেখাতে হবে এবং গত এক বছর কোথায় কি করে কাটিয়েছে তার ফিরিস্তি দিতে হবে। এভাবে আমেরিকাতে বাংলাদেশিদের অবৈধভাবে থাকার এবং কাজ করার রাস্তা প্রায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

তবে যারা আগে থেকেই পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করছেন এবং ইতিমধ্যেই গৃনকার্ড বা সিটিজেনশিপ পেয়ে গেছেন তাদের সে রকম কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এ দেশে অফিস-আদালতে কাজের পরিবেশ খুবই ভালো। মানুষজনের ব্যবহারও বেশ চমৎকার। অনেক বাংলাদেশিই বাড়ি-গাড়ি কিনে একেবারে রাজার হালে আছেন। এদের অনেকের জীবনযাত্রার মান আমেরিকান মধ্যবিত্তদের মতো।

বিল ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ব্যাপক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে কমপিউটার সায়েন্স বা অন্যান্য সাবজেক্টে পাস করে প্রায় সবাই চাকরি পেতো। কিন্তু বর্তমানে পাস করে চাকরি পাওয়া বেশ দুষ্কর হয়ে পড়েছে এবং আমাদের মতো বিদেশিদের জন্য তো প্রায় অসম্ভব। দুই চার বছর আগেও পাস করেছে চাকরি পায়নি এ রকম কথা প্রায় একেবারে শোনাই যেতো না। বর্তমানের অবস্থা ঠিক তার উল্টো।

এ সমস্ত কারণে অনেকেই দেশে ফিরে গিয়েছেন কিংবা যাওয়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছেন। আমার পরিচিত বেশ কয়েকজন পাস করে ইতিমধ্যেই দেশে ফিরে গিয়েছেন। কেউ কেউ আবার কানাডায় পাড়ি জমানোর চেষ্টা করছেন।

সবশেষে এ কথা, বলবো যে, ভালো কিছু পেতে হলে কিছু স্যাকৃফাইস করতে হবেই। আমেরিকার ইউনিভার্সিটিগুলোর লেখাপড়ার মান বিশ্বে সবচেয়ে উচু। তাই যারা এখানে এসে লেখাপড়া করার চিন্তা-ভাবনা করেছেন তারা শুধু অসুবিধার কথা ভেবে পিছুপা না হয়ে বরং যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। আমার বিশ্বাস, শত অসুবিধা এবং বাধা-বিপত্তির মাঝেও চেষ্টা চালিয়ে গেলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানোর এখনো যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে।

মিনিসোটা, আমেরিকা থেকে

বিপন্ন নিবাস

– শামীম আল মামুন

শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির
লিখে রেখো এক ফোটা দিলেম শিশির।

সেই স্কুল জীবনের ভাবসম্প্রসারণটি আজও ভুলিনি। কেননা আমরা বোধহয় ওই শৈবালের মতোই। জীবনে কারো কাছ থেকে কি পেলাম সেটা আমাদের বিবেচনায়ই আসে না। অথচ দেয়ার পরিমাণটা সামান্য হলেও

ভাবি অনেক বড় করে। সময়ের ব্যবধানে কবিতার ওই দুটি লাইন আমার জীবনে আজ প্রচণ্ড অর্থবহ। বাবার আদর থেকে বঞ্চিত ছিলাম সেই শৈশব থেকেই।

বড় ভাই সউদি প্রবাসী ১৯৯১-এর ডিসেম্বর থেকে। আমি তখন ক্লাস টেন-এ পড়ি। দুই বোন, দুই ভাই এবং মাকে নিয়ে আমাদের ছোট্ট সংসার। বড় ভাই বাইরে থাকেন। তখন থেকেই সংসারের দেখাশোনা আমাকেই করতে হতো। পুরো পরিবারটাকে আগলে রাখতাম। সংসার খরচের চাপ কমাতে তখন থেকেই বেশ টিউশনি করতাম। নিজের হাতে সংসার খরচের পুরো টাকা থাকা সত্ত্বেও টিউশনির টাকা দিয়েই নিজের পকেট খরচ চালাতাম।

সংসারের গার্ডিয়ান হিসেবে নিজেকে সংযত রাখতে পেরেছি সব সময়। বড় ভাইকে নিজের হৃদয়ে বসিয়েছি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার দেবতা হিসেবে। বাবার অবর্তমানে সংসারের পেছনে তার অবদান অসামান্য। সব সময় স্বপ্ন দেখতাম, প্রতিষ্ঠিত হয়ে কতো দ্রুত তার পাশে দাড়াবো! সময় এগিয়ে চললো। কলেজে পড়া অবস্থায় একজনের সঙ্গে শেয়ারে ব্যবসায় নামলাম। পরবর্তীকালে তার প্রতারক মনোভাবের কারণে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম।

এক বছরে সামান্য কিছু অর্থ উপার্জন করলাম এবং ব্যবসায় খাটানো পুজি এক লাখ টাকা ফেরত নিয়ে নিলাম। কমপিউটার শেখা শুরু করেছিলাম কলেজে থাকতেই। অবশেষে ডিগ্রি পাসের পরে গার্মেন্টস এক্সেসরিজ সাপ্লাইয়ার হিসেবে কাজ শুরু করলাম। একই সঙ্গে বাড়িতে কমপিউটারের কোর্স করাতাম। ভালোই চলছিল সব কিছু।

এরই মধ্যে প্রবাস জীবনে বড় ভাইয়ের কেটে গেছে দশটি বছর। ছুটিতে দেশে এসেছেন বেশ কয়েকবার। কর্তব্য ও ভালোবাসার খাতিরে এবং বিবেকের দংশনে ভাইকে আর বিদেশে থাকতে দিতে মন চাইলো না। এদিকে সমস্ত পরিবারের খরচ একা চালানোর মতো আমার অবস্থানও সুদৃঢ় নয়। তাই ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি প্রবাসে আসবো, তাকে দেশে পাঠিয়ে দেবো। জীবনের সে সিদ্ধান্তই আমার কাল হলো। ভালোবাসার আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিশ্বাসঘাতকতা কল্পনাতেও টের পাইনি।

অবশেষে ২০০১-এর সেপ্টেম্বরের আনলাকি থারটিন-এ পা রাখলাম এই মরুভূমির দেশ সউদি আরবে। ভাইয়ের কথা ছিল এক রকম কাজ ঠিক করেই আমাকে বিদেশে আনছেন। এসে দেখলাম পুরো উল্টো। নিজেই বিভিন্ন অফিসে ঘুরে ঘুরে কমপিউটার ডিজাইনার প্লাস অপারেটর হিসেবে কাজ যোগাড় করলাম। এ ব্যাপারে ভাইয়ের কোনো রকম সাহায্য পেলাম না।

সউদি আরব এবং সম্ভবত মিডল ইস্ট-এর সব দেশেই কন্ট্রাক্ট এবং ট্রান্সফার ছাড়া কাজ করা যায় না। কোনো কম্পানি দুই বছর এবং কোনো কম্পানি তিন বছরের কন্ট্রাক্টে শ্রমিক নিয়োগ করে। এ সময়ের মধ্যে নিয়োগকৃত শ্রমিক কোনোমতেই ওই কম্পানি থেকে অন্য কম্পানিতে যেতে পারে না। এখানে লেবার প্রফেশন একটা অত্যন্ত বড় বিষয়। এক প্রফেশনের লোক অন্য প্রফেশনে ট্রান্সফার এক জটিল সমস্যা। তবে যাদের প্রফেশন জেনারেল লেবার তারা সবক্ষেত্রে ট্রান্সফার হতে পারে। উচ্চ প্রফেশনের লোক নিম্নতর কোনো কাজ করতে বাধা নেই।

অফিসে তিন মাস প্রবেশনারি পিরিয়ড শেষে যখন ট্রান্সফারের প্রশ্ন এলো তখনই সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খেলাম। কেননা আমার ভিসা প্রফেশন ছিল *মাজরা ভিসা* অর্থাৎ কৃষি ভিসা। এখানে যারা ক্ষেত-খামারের কাজে আসে তাদেরকে মাজরা ভিসায় আনা হয়। আমার ট্রান্সফার বন্ধ হয়ে গেল এবং চাকরি চলে গেল ভিসার কারণে।

মনের দিক থেকে পুরোপুরি ভেঙে পড়লাম। কারণ যেখানেই চাকরি পাচ্ছি সেখানে সমস্যা ওই একটাই। আগে ভিসা প্রফশন চেঞ্জ করতে হবে। অবশেষে এখানে আরেক ভালো কম্পানিতে ক্যাশিয়ার হিসেবে চাকরি পেলাম। তখন শেষমেষ আমার বড় ভাই আমার প্রফেশন চেঞ্জ করে দিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন।

যে আশা ও স্বপ্ন নিয়ে বিদেশে এসেছিলাম তার পুরোটাই ভেঙে খান খান হয়ে গেল। এছাড়াও আমার সঙ্গে বড়ভাই আরো এমন কিছু আচরণ করলেন যা আমার পক্ষে মানসিকভাবে মেনে নেয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠলো।

সারা জীবনের বিশ্বাস একবার ভেঙে গেলে তা পুনঃস্থাপন করা বোধহয় আর সম্ভব হয় না। ভাইয়ের প্রতি আমার বিশ্বাস, ভালোবাসা সবই নষ্ট হয়ে গেল তার ব্যাখ্যাহীন কাজের কারণে। তার ঘর ছাড়তে আমি বাধ্য হলাম নিঃস্ব হাতে।

দীর্ঘ চার মাস যাবৎ বড় কষ্টে জীবন কাটিয়েছি কপর্দকহীন অবস্থায়। থাকা খাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। বিদেশে ভাগ্য ফেরাতে এসে ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আমি আজ নিঃস্ব। অবশেষে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। এভাবে সময় নষ্ট না করে দেশে ফিরে যাবো। তখন পাশে এসে দাড়ালো এক ক্লাসমেট যে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার আশ্বাসে আমার থাকা–খাওয়ার টেনশন দূর হলো। কিছুটা নিশ্চিত হলাম।

অবশেষে আপন বড় ভাইয়ের মতোই পাশে দাড়ালেন আরেকজন। তিনি আমার ভিসা প্রফেশন চেঞ্জ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। জীবনে কিছুটা আশা ফিরে পেলাম। হয়তো এবার চাকরি করাটা সমস্যা হবে না। দেশে যাবার সিদ্ধান্ত বাদ দিলাম। আপন বড় ভাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতার পর যাকে পেলাম বড় ভাই হিসেবে, জানি না তার সহযোগিতা কতোটুকু পাবো! তবে তার আশ্বাসই আমার মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার করেছে।

এই ছিল আমার দুঃখের ইতিহাস। যেহেতু বড় ভাইয়ের পরিচালনায় আমাদের সংসার তাই মা, বোন সবাই আমাকে ছাড়লো। আপন নিবাসে আমার অবস্থান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এ প্রবাস আমার কাছে আজ বিপন্ন নিবাস। আজও নিভৃতে মায়ের জন্য চোখের জল ফেলি। জানি না আমার মা সেটা বোঝেন কি না। মায়ের স্নেহ বঞ্চিত হতে কে চায়? আমার মতো দুর্ভাগ্য যেন কারো না হয়। প্রবাসে আসার স্বপ্ন যেন কারো এভাবে ভেঙে না যায়।

রিয়াদ থেকে

কান্না

– মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন খান পিন্টু

প্রবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখতে বসে মাথার হার্ড ডিস্কে ভর্তি শ শ বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে ছেকে বের করতে পারছি না কি রেখে কি লিখবো, কোথা থেকে শুরু করবো। কারণ আমার জীবনের বত্রিশটি বছরই কেটেছে বিদেশে। মাত্র দুই বছর বয়সে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে তেজগাও এয়ারপোর্ট থেকে চড়েছিলাম করাচিগামী বিমানে। সেটা ছিল আমার প্রথম বিমান ভ্রমণ। এরপর শততম ফ্লাইটও পার হয়ে গেছে অনেক আগেই।

আমার হিসাবের একশ দশতম ফ্লাইটে গত ফেব্রুয়ারি ২০০৩–এ সউদি আরব ফিরছিলাম। স্ত্রী ও চারটি ছেলেমেয়ের কাছ থেকে এ পর্যন্ত কতোবার যে বিদায় নিয়েছি তার হিসেব নেই। তবুও জানালার বাইরের পেজা তুলোর মতো উড়ে যাওয়া মেঘের দিকে চেয়ে কাদছিলাম। ছোট ছেলেমেয়ে দুটোর শেষ কথা, বাবা আর দুটো দিন থেকে যাও না, কোরবানির ঈদটা করে যাও না, গরু কাটবে না? তুমি না থাকলে তো আম্মু কিছুই করবেন না।

এসব কথা মনে পড়ে চোখ কান্নায় ভিজে আসছিল। কিন্তু আমার অফিসের কঠোর আইন, ছুটি শেষ হলে একটা দিন দেরি করলে চলবে না। একদিনের জন্য চার দিনের বেতন কাটা যাবে। মনে পড়ে গেল, মাস দুয়েক আগে ছুটিতে দেশে যাচ্ছিলাম। তখন আমার এক সিট পরে এক বাংলাদেশি মহিলা দেশে ফেরার খুশিতে কেদে ফেলেছিলেন। তিনটি শিশু সন্তান ফেলে তিনি মদিনার কাছে কোনো এক হাসপাতালে নার্সের চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন। দুই থেকে তিন বছর পর আজ চলেছেন দেশে। এই বছর কয়টি তার যে কিভাবে কেটেছে তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন।

আমি চাকরি করি সউদি আরবের অপর মাথায় লোহিত সাগরের পাড়ে *ইয়ানবু* নামে এক শহরে। প্রজেক্টের নাম এস.ডাবলিউ.সি.সি অর্থাৎ স্যালাইন ওয়াটার কনভার্শন কর্পরেশন। এখানে ইয়ানবু ও মদিনা শহর দুটির জন্য খাবার পানি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এই মরুভূমির শহরে নদ–নদী নেই বললেই চলে। তাই সমুদ্রের পানিকে লবণমুক্ত করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে শহরগুলোতে সরবরাহ করা হয়। ইয়ানবু থেকে ঢাকা যাওয়া–আসা করতে পাচটি ফ্লাইট বদল করতে হয়। এখন হিসাব করে দেখুন, তেরো বছরে আমাকে কতোটি ফ্লাইটে চড়তে হয়েছে। কোনো কোনো বছর দুইবারও ছুটিতে যাই। কারণ বছরে একবার কম্পানি টিকেট দেয়, অন্যটা নিজের টাকায়। কিন্তু এটা তো গেল আমাদের কম্পানির কথা।

আমাদের বেতন বেশি বলে তা পারি। কিন্তু আমাদের দেশের এমনো হতভাগা বাঙালি আছে যারা পাচ ছয় বছরে একবার দেশে যেতে পারে। তাদের বেতন এতো কম যে, শুনলে আপনারা বিশ্বাসই করবেন না। তিনশ থেকে পাচশ রিয়াল অর্থাৎ পাচ থেকে আট হাজার টাকা। লাখ লাখ টাকা খরচ করে এসে যা কামায় তা আকামা, পাসপোর্ট প্রভৃতি রিনিউ করতে চলে যায়। খাওয়ার টাকা জোটায় সউদিদের গাড়ি মুছে। গাড়ি মুছতে গিয়েও নানান বিড়ম্বনা। কেউ কেউ মিথ্যা চুরির দায়ে বা আকামা না থাকায় ধরা পড়ে জেলে পচে মরে। জেলে ঢুকলে বাচানোর কেউ নেই।

এক বাঙালি বিরান এক এলাকায় মালির কাজ করতো। তার মালিক কয়েকটা উট ও কিছু শুকনো রুটি দিয়ে যেতো। উট চরানো ও খেজুর বাগান দেখার কাজ। দুই তিন দিন পর এসে আবার কিছু শুকনো রুটি। একদিন ওই লোকটিকে সাপে কাটলো, বেচারাকে বাচানোর কেউ নেই। সে প্রধান সড়কের পাশে বেহুশ হয়ে পড়েছিল, কোনো এক গাড়ির চালক ওই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তাকে দেখে হাসপাতালে নিয়ে যায়। না হলে ওখানেই মরে পড়ে থাকতো। এ রকম শ শ ঘটনা ঘটছে।

বাবা–মা, ভাই–বোন, আত্মীয়–স্বজন রেখে কয়টা টাকা উপার্জনের জন্য এখানে সারা দিন চোখের পানি ফেলে ডিউটি করেও কয়েকশ লোক চার পাচ মাস যাবৎ বেতন পায় না। থাকা, খাবার ও চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই তাদের ঠিকমতো নেই। মরুভূমির প্রচণ্ড গরমের মধ্যে রাতে ভেজা কম্বল জড়িয়ে শুয়ে থাকে। এখানে এতো গরম পরে যে, এয়ারকন্ডিশন ছাড়া থাকা মুশকিল।

এতো গেল সউদি আরবের সামান্য চিত্র। এর আগে নয় বছর ইরাকের বাগদাদ শহরে ছিলাম ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৭। সেখানেও বিচিত্র অভিজ্ঞতা কম হয়নি। এক বাঙালি ভদ্রলোক তার পঙ্গু বন্ধুর স্ত্রীকে নার্সের চাকরি দেয়ার নাম করে বাগদাদ নিয়ে আসে। চাকরিতে অপারগ এক সন্তানসহ অভাব–অনটনে জর্জরিত স্বামী রাজি হয়। কিন্তু সেই পাষণ্ড বন্ধুটি তার বন্ধুপত্নীকে চাকরি না দিয়ে নিজের রক্ষিতা করে রাখে। মহিলার পাসপোর্ট, আকামা নিজের কবজায় রেখে ভয় দেখায় যে, যদি কাউকে বলে দেয় তবে জীবনে দেশে ফিরতে পারবে না। আকামা ও পাসপোর্ট ছাড়া বাইরে গেলে পুলিশের হাতে পড়লেও রক্ষা নেই। এতেও ওই লোকের শখ মিটলো না।

বন্ধুর সুন্দরী স্ত্রীটির মাধ্যমে টাকা কামানোর খেয়াল জাগলো তার। আর কি? শুরু হলো মহিলার ওপর অত্যাচার। একদিন এক সহৃদয় ব্যক্তি গিয়েছি পাষণ্ড বন্ধুটার খোজে তার বাসায়। সুযোগ পেয়ে কেদে-কেটে বন্ধুর স্ত্রীটি তার অত্যাচারের কথা সব জানায়।

আমি তখন বাগদাদের এমবাসির গঠিত একটি পঞ্চায়েত কমিটির মেম্বার। আমরা পুলিশের কাছে না গিয়ে কিছু কিছু সমস্যার সমাধান নিজেরাই করার চেষ্টা করতাম যেন দেশের বদনাম না হয়। ওই সহৃদয় ব্যক্তিটির মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে আমরা ওই কুখ্যাত লোকটাকে ধরে এনে খুব উত্তম-মাধ্যম দিলাম। এরপর তাকে একটি চুক্তিপত্র সই করালাম। এক সপ্তাহের মধ্যে ওই মহিলার দেশে যাবার ব্যবস্থা করা ও তাকে একটি মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয়া। এবং তার বাড়িতে ও মহিলার বাড়িতে এসব ব্যাপারে কিছুই জানান হবে না বলে সবাই অঙ্গীকার করলাম।

এ রকম শত সহস্র ঘটনা আমার স্মৃতিতে ভরা আছে।

সউদি আরব থেকে

তপ্ত সাহারা

– মিজানুর রহমান

আমার বাল্যবন্ধু যারা আছে তারা কেউই বিয়ে করে বৌ দেশে রেখে বিদেশে যেতে ইচ্ছুক নয়। প্রয়োজন বোধে মধ্য বয়স পর্যন্ত ব্যাচেলর থাকবো তবুও না। কারণ জানতে চাইলে তারা বলে, বৌ কি মানুষের কাছে বর্গা দিয়ে যাবো নাকি!

এটা কি ধরনের কথা?

তবে ভেবে দেখেছি কথাটি একেবারে খেলনা নয়। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপারটি বর্গা দেয়া না হলেও তা নিজের অজান্তে নিজের জমিতে অন্যের গরু লাঙ্গলের চাষ হয়ে দাড়ায় বৈকি।

আমার এক সুদর্শন মামাতো ভাই একদিন আমাকে বললো একটি মেয়ের কথা। মেয়েটি নাকি তাকে ঘরে টেনে ধরেছে এবং তাকে পাওয়ার জন্য অনেক অনুনয়, বিনয় করেছে। অবশ্য আমার মামাতো ভাইয়ের যে চেহারা, শারীরিক গঠন তাতে যে কোনো মেয়েরই মাথা ঝিম ঝিম করবে।

যে মেয়েটির কথাও বললো সে মেয়েটি দেখতে খুবই সুন্দরী এবং তারই সমবয়সী। স্বামী তিন বছর যাবৎ প্রবাসী। শুনে বললাম, এতো খুব ভালো মেয়ে।

শুনে ভাইটি বললো, ভালো তো বটেই। ভালো না হলে সে থাকতে পারতো না। কিন্তু মিয়াভাই, তপ্ত সাহারা কি মেঘের ভেলা সহ্য করতে পারে?

শুনে হেসে ফেললাম। তপ্ত সাহারা! আসলেই তাই।

প্রবাসীদের বৌদের বেশির ভাগের বয়স আঠারো ত্রিশ-এর কোঠায়। জীবনের সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় যেমন যৌবনের দিক দিয়ে তেমন জীবনের দিক দিয়েও। এ সময়টিতে স্বামী দেবতা শান্ত পুকুরে ঢিল ছুড়ে যে ঢেউ তুলেই চলে যান তা সামাল দেয়া কতো যন্ত্রণার সেটা ভুক্তভোগীই জানে। সবার ক্ষেত্রে তা সম্ভবও হয় না।

মনকে বোঝালে বিক্ষুব্ধ হয় শরীর। আবার শরীরকে শান্ত করলে অশান্ত হয় মন। কিছুতেই চাওয়া-পাওয়ার সমন্বয় হয় না। তাছাড়া চারপাশের লোভাতুর হায়েনাদের মাকাল ফলের ডালা, প্রেম সুখের মিথ্যা গল্প কতোক্ষণই বা সহ্য করতে পারে এই বয়সের একজন মানুষ।

তবুও ধন্য বলতে হয় আমাদের এই ভগিনীদের। তাদের বিশ্বাস করে তাদের মুখে হাসি ফোটাতেই তো আমাদের ভাইদের সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ওই স্বজন হারাদেশে গমন। দেশের অর্থনীতিকে করছে চাঙ্গা।

খুব শিগগিরই আমাদের এ *বুক ফাটে তো মুখ ফুটে না* ভগিনীদের কষ্টের সমাপ্তি ঘটুক, ভাইয়েরা ফিরে আসুক তাদের কাছে স্বপ্ন সুখের ডালা নিয়ে।

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে
hashi019@yahoo.com

আয়মা

– মীর মোবাশ্বের আলী

আমার নাতনি সত্যিকার অর্থেই প্রবাসী। যুক্তরাষ্ট্রে বা আমেরিকায় জন্ম। অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্রের বদলে আমেরিকা বললেই সহজ শোনায়। দেশে আসছে বেড়াতে। অবশ্য এই প্রথম নয়, আগেও এসেছে। তখনকার কথা ওর খুব ভালো মনে নেই। এবারই প্রথম একটা শিশু মন নিয়ে নতুন করে সব কিছু দেখতে শিখেছে। তারই দুই একটা কথা, অভিব্যক্তি শোনাতে চাই।

প্লেন থেকে নেমেই মাকে ছেড়ে সোজা চলে এলো দাদা–দাদি, নানা–নানির কাছে। মায়ের মালপত্র নামিয়ে আনতে অনেকটা সময় লাগবে। হাতে একটা পুতুল নাম *লিলিয়ে* আর একটা কার্টুন ক্যারেকটার ফ্রগি। কোথায় এসেছো জিজ্ঞাসার উত্তরে খুব মিষ্টি করে একটু ইংরেজি একসেন্টে বললো, বাংলাদেশ।

আয়মা মীর, চার বছরের এই মেয়েকে একটু অপ্রস্তুত করার জন্য বা ভয় দেখানোর জন্য দুটো খেলনা ইদুর, দেখতে বেশ সুন্দর বাস্তবের কাছাকাছি গাড়ির সিটের ওপরে রেখেছিলাম। ইদুর দুটো ধরে সে মহাখুশি। মোটেই শংকিত নয়, বরং সে এই দুটোর নাম রাখার জন্য ব্যস্ত। বলা হলো, নাম রাখো টিকি আর লিকি। এই নামের ইদুর নিয়ে একটি বাংলাদেশি গল্প আছে মঈনুল আহসান সাবের–এর লেখা।

বিদেশে বাচ্চাদেরকে অন্য প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল ও বন্ধুভাবাপন্ন হতে শেখানো হয়। ছোট ক্লাসে ও নার্সারিতে কোনো একটা পোষা প্রাণী রাখা হয়। অনেক সময় ইদুরও পোষা প্রাণী হিসেবে খাচায় রাখা হয় ও এর যত্ন নেয়া হয়। আমেরিকায় আয়মাদের বাড়িতে একটা বড় গাছ আছে। সেখানে কাঠবিড়ালির পরিবার থাকে। তারা মাঠে তো ঘুরে বেড়ায়ই, বারান্দায়ও ওঠে আসে। অনেক উৎপাত করে তবুও কেউ তাড়ায় না। আয়মা অনেক সময় হাতে চকলেট নিয়ে কাঠবিড়ালকে ডাকে। বলে, *ও কাটবিড়ালি, একটা চকলেট খেয়ে যাও।*

কাঠবিড়ালি এখনো হাত থেকে খাবার খায় না। তবে মনে হয়, বছর খানেকের মধ্যে খাবে।

এয়ারপোর্ট থেকে বাসায় আসার সময় সে রিকশা দেখে চিৎকার করে ওঠে আমি স্ট্রলারে চড়তে চাই বলে। সে রিকশার নাম দিয়েছে *স্ট্রলার*। বিদেশে ছোট বাচ্চারা বসতে শিখলেই তাদের একটা চাকাওয়ালা সিটে বসিয়ে সব জায়গায় টেনে নেয়া হয়। কিছুদিন আগেও আয়মা স্ট্রলারে ঘুরে বেড়াতো। তাই রিকশা দেখেই নাম দিয়ে দেয় স্ট্রলার। সত্যি বলতে কি, বিদেশিদের জন্য এভাবে রিকশার সংজ্ঞা দেয়া যায় যে, বড়দের জন্য স্ট্রলার যা একজন কর্মী (মজুর) সব জায়গায় টেনে নিয়ে যায়।

রাতে বিছানায় শোয়ার সময় ওর বাবা মা সঙ্গে নিতে চায়নি এ জন্যে যে, ওর অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে। বিদেশে বাচ্চাদের নিজেদের আলাদা ঘরে থাকতে দেয়া হয়। বাচ্চার ঘরের খাট, বিছানা, চাদর, টেবিল, চেয়ার, জানালার পর্দা সব কিছু বাচ্চার জন্য বিশেষভাবে তৈরি হয়। এসব কিছু বাচ্চার নিজের পছন্দ মতোই

করা হয়। আয়মার পছন্দের রঙ পিংক বা গোলাপি। তাই ওর ঘরের প্রায় সব কিছুই গোলাপি রঙের। আয়মা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাদা–দাদির সঙ্গে শোবার সময় কিছুতেই মশারির ভেতর যেতে চায় না। সে মশারির নাম দিয়েছে কেইজ বা খাচা। খালি বলে কেইজে ঢুকতে চাইনা অথবা দরজাওয়ালা কেইজ চাই। খাচা তৈরি হয় কিছুকে আটকে রাখার জন্য। আর মশারি হচ্ছে মশাকে বাইরে রাখার জন্য। মশারির ভেতর শান্ত হয়ে শুয়েই বলবে, গান বলো, ঘুম পাড়ানি গান। আমরা তো শুধু দুটো প্রচলিত ঘুম পাড়ানি গান জানি। *খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে,* এবং *ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এসো*। কিন্তু ওর অনুরোধে গানের কথা বানাতে হতো। বাচ্চাদের গান, গল্প বানান, খুব কঠিন নয় একটু চেষ্টা করলেই পারা যায়।

একদিন কোথাও যাওয়ার সময় ওকে বললাম, এই রাস্তার নাম এলিফ্যান্ট রোড (হাতি রাস্তা)।

সঙ্গে সঙ্গে সে বলে মাউস রোডে (ইদুর রাস্তা) যেতে চাই। যখন বলা হলো মাউস রোড নেই তখন বলে, তাহলে এনিমেল রোড (পশু রাস্তা) নিশ্চয়ই আছে!

আয়মা শব্দ নিয়ে খুব সচেতন আর কঠিন শব্দের ব্যবহার করতে খুব পছন্দ করে। যেমন নিশ্চয়ই, অবশ্যই, সম্বন্ধে, ইত্যাদি। একদিন ওর টুনি ফুপু ওকে খেপালে বলে ওঠে, *খবিস*।

ওকে অপ্রস্তুত করার জন্য সবাই ছিঃ ছিঃ করে ওঠে সে।

আমার কাছে, এসে কানে কানে বলে, কোথাকা।

ও কোন সময় খবিস কোথাকার শব্দটা শুনে থাকবে। পুরো অর্থ না বুঝে ভেবেছে খবিস যদি খারাপ হয় তাহলে কোথাকার নিশ্চয়ই তারচেয়েও খারাপ শব্দ।

আয়মা ইংরেজি শব্দ সম্বন্ধেও খুব সচেতন। একদিন গল্পের বই কিনতে যাওয়ার সময় আমরা বলি, লাইব্রেরিতে যাচ্ছি। কিন্তু সে সব সময়ই বলতে থাকে বুক স্টোর। আমরা সাধারণভাবে বইয়ের দোকানকেও লাইব্রেরি বলি। কিন্তু সে কিছুতেই তা বলবে না।

আমাদের বাড়ির কাজের মেয়ে জাহিদা। আয়মা ওকে জাহিদাআপু বলে আর বাড়ির অন্যদের সঙ্গে পার্থক্য করার কোনো কারণ দেখতে পায় না। সবাইকে আদর করে চুমু দেয়। জাহিদাকেও দেয়। সব সময় নালিশ, জাহিদাআপু কেন টেবিলে বসে আমাদের সঙ্গে খায় না, গাড়িতে বেড়াতে যায় না ইত্যাদি। এই শ্রেণী ভেদটা শেষ পর্যন্ত কেউ আয়মাকে বুঝিয়ে দিতে পারেনি। সবাই কাজের মেয়ের প্রতি ব্যবহারের এই তারতম্যটা স্পষ্ট করে দিতে সংকোচ বোধ করেছে।

আমরা নামাজ পড়ার সময় সব সময় সে এসে দাড়াতো ঘোমটা মাথায় দিয়ে। তখন ওর চুল বড় ছিল। ওর মা একদিন চুল কাটিয়ে আনে ছেলেদের মতো করে। সে বলতে থাকলো যে, সে ছেলে হয়ে গেছে, আর ঘোমটা দিয়ে নামাজ পড়বে না। তখন সে টুপি পরে নামাজে দাড়াতো। এবং ভাঙা ভাঙা কলেমা ও সুরা ফাতেহা পড়তো।

আয়মার বাংলাদেশ খুব পছন্দ। এখানকার সব কিছু। রোদ, আলো,বাতাস, মাঠ, গাছপালা, পাখি, বাড়িঘর, দোকানপাট, রাস্তাঘাট, যানবাহন ইত্যাদি যা কিছু দেখেছে সব কিছুই ভালো মনে হয়েছে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া, এমনকি ফকিরদেরকেও। ফকির দেখলে আয়মা খুব উৎসাহিত হয়ে যেতো কিছু দেয়ার জন্য। এতো ভালোলাগা ছেড়েও ওকে চলে যেতে হলো আমেরিকায় বাবা মায়ের সঙ্গে। ছয় সপ্তাহ পর যাওয়ার সময় আমরা সবাই কাদছিলাম শুধু আয়মা ছাড়া। সে বেশ হাসি হাসিভাবে হাত নেড়ে বলছিল বাই, বাই।

ঢাকা থেকে

আমার মা

– ফয়েজ আহমমদ ভূঁইয়া

আমিও মরতে প্রস্তুত। কিন্তু কার জন্য! কি লাভ হবে, কি পরিচয় আমাদের? লাখ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময় দীর্ঘ এতো বছর আগে যে দেশটির জন্ম হয়েছে তার পরিচয় এখনো বিশ্বে দিতে কষ্ট হয়। আমরা কখন গর্জে উঠবো, কখন আমাদের দেশাত্ববোধ জাগ্রত হবে।

আমার কাজ ছিল জাপানের রঙ্গমঞ্চ শহর রোপ্পংগি–তে যাকে বিদেশিদের স্বর্গরাজ্য বলা হয়।

একদিন সকালে স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় দাড়িয়ে পত্রিকা পড়ছিলাম। আমার চাইতে আরো প্রায় এক হাত লম্বা এক কানাডিয়ান মদের বোতল হাতে মাতাল অবস্থায় আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমিও বিদেশিদের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাসবশত *হাই* বলে সম্বোধন করলে সে উত্তরে, Where'r you form?

বাংলাদেশ বলি।

তৎক্ষণাৎ সে বলে, Oh... বেংলাদেশ! আমি চিনি, বন্যার দেশ, নিচু সমতল ভূমি, সব কিছু সমস্যাযুক্ত ইত্যাদি।

এতো মানুষের সামনে লজ্জায় অন্যত্র সরে দাড়ালাম।

অন্য একদিন। আমি প্রতিদিন ট্রেনে যে সিটে বসি আমার পাশে সিটে প্রায় নিয়মিত দুইজন কোরিয়ান বৃদ্ধা মহিলা বসতেন। কয়েকদিনের দেখাদেখিতে তাদের কথা বলার আগ্রহ দেখে, তাদের দেশের সামান্য ভাষা জানার সুবাদে আগ্রহের সহিত উত্তর দিলে তারা জানায়, বাংলাদেশ চেনে না। তখন অন্যদের মতো *ইন্দোনো তোনারি* অর্থাৎ ইনডিয়ার সঙ্গের দেশ। *আ...বাঙ্গুরা কা? খাওয়াইছো* (বিপদগ্রস্ত, অসহায়), গরিব দেশ, বাচ্চাদের হাড় গোনা যায়। *গাম্বাত্বে নে!* (সাহসিকতার সঙ্গে ঠিক মতো কাজ করিস)।

টিভিতে এনজিও যেভাবে দেখাচ্ছে সেই থেকে প্রথম আমাদের দেশ চেনে বলেছিল। পরদিন একটু দূরে সিট পাল্টিয়ে বসলে তারা কথা বলতে চাইলে তাদের দেশের কিছু ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় তাদের টিজ করি মনের দুঃখে। তখন তারা আমার নাইজেরিয়ান বন্ধুকে বলে, সে তো ভদ্রছেলে, আজ কি হয়েছে?

আমি যে রেস্টুরেন্টে কাজ করতাম সেখানে আগে এক প্রবাসী লেখকভাই কাজ করেছিলেন। বিভিন্ন কারণে তিনি জাপানিজের সঙ্গে মিশতে না পারাতে কিছুদিন কাজ করে একটু মিথ্যা বলে কাজ ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বসের সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় ও কিছুটা বন্ধুত্ব থাকাতে তার লিখিত বই এবং পৃন্সেস ডায়ানার হাতের লেখা তার প্রশ্নের উত্তর বস দেখেছিলেন। আমি কাজে যোগ দেয়ার পর তাকে চিনি কি না বস জিজ্ঞাসা করলে তাকে চিনি বলে উত্তর দিই। এবং বিস্তারিত আলাপে বুঝতে পারেন আমি ও আমার দেশকে ছোট ভাবার পাত্র নই।

অনেক বছর আগে থেকে এই রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশি কাজ করছে। তাই খাওয়ার অর্ডার মেনু থেকে শুয়োরের মাংস বাদ দেয়া হয়েছে। আমাকে এতো বেশি আদর ও সহানুভূতি দেখাতো যে, আমি যে দুই বছর কাজ করেছিলাম, একজনের কথা চিন্তা করে পনেরোজনের প্রতিদিনের খাওয়ার তৈরিতে তারা মাত্র তিন দিন শুয়োরের মাংস খেয়েছে এবং আমার জন্য গরুর মাংস।

একদিন বসের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় গল্প করার সময় তিনি বলে ফেলেন গ্লোব–এ দেখা যায় না, ছোট্ট একটি দেশ নিয়ে তোদের এতো গর্ব কিসের?

তার কিছুদিন আগে বসের মা মারা গেলে তিনি আমার সামনে খুব কেদেছিলেন। বসকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার মাকে আপনি কতোটুকু ভালোবাসতেন?

বস উত্তরে বলেন, অনেক অনেক বেশি।

বসকে বলি, আমার জন্মভূমি মাকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। ছোট্ট হলেও সেটি আমার অনেক কিছুর বিনিময়ে পাওয়া মা।

বস আশ্চর্য হয়ে আমার পিঠে ছোট্ট একটি থাপ্পড় দিয়ে হেসে বলে উঠেন, সুভারাশি বাংগুরাজিন! অর্থাৎ বাহবা, সাব্বাস বাংলাদেশি!

আমিও হেসে বলি, *দোমো আরিগাতো গুজাইমাস, গাম্বারিমাস*! অর্থাৎ অনেক ধন্যবাদ, আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবো!

টোকিও, জাপান থেকে

মমত্ববোধ

- এম. শরীফ

সেজ ভাইয়ের ছেলেটি অতিশয় অমায়িক। যে কোনো ধরনের মানুষের সঙ্গে সে অনায়াসে মিলেমিশে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারে। আমি তেমনটি পেরে উঠি না। সে জন্যই হয়তো আমার মতো সূক্ষ্ম রুচির মানুষেরা সহজে সুখী হতে পারে না। ভাইপোর বদৌলতে আমাদের রক্ত সম্পর্ক ছাড়াও পাতানো আত্মীয়ের সংখ্যা কম নয়। এ রকম আত্মীয়ের বিব্রতকর অভিজ্ঞতা হলেও এভাবে বেশ কয়েকজন ভালো মানুষের সঙ্গে সখ্যতা হয়েছে। এদের নিবিড় উষ্ণতায় অনুভব করি অনাবিল প্রশান্তি।

পাচ ছয় মাস আগে জীবনের পড়ন্ত বয়সের অপরিচিত এক মহিলাকে বাসায় দেখে বুঝতে পারি নতুন অতিথি। তার একমাত্র প্রবাসী ছেলের অবয়ব নাকি ভাইপের মতো। ভদ্রমহিলার স্বামী, বড় ছেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাবার পর গ্রাম্য রাজনীতির শিকার হয়ে প্রায় দেড় যুগ আগে ছোট ছেলেকে নিয়ে টঙ্গী আসেন। অনেক আগেই পরিশ্রম করে টঙ্গীর শহরতলিতে মাথা গোজার ঠাই করেছে।

খেয়ালের বশে স্থানীয় সুন্দরী, খানিক শিক্ষিতা এক মেয়েকে ছেলের বৌ করে ঘরে তোলেন। সাজানো সংসারে বিপত্তি তখন থেকেই শুরু। মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৌয়ের পীড়াপীড়িতে বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য ছেলেকে সউদি আরব পাঠিয়ে দেন। ভাগ্য প্রসণ্ন থাকার ফলে প্রবাসে ভালো কম্পানিতে আকর্ষণীয় বেতনে চাকরি জুটে যায়।

এদিকে দেশের সব কিছু বৌয়ের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সহজ-সরল, অশিক্ষিত, সেকেলে শাশুড়িকে ন্যূনতম চাহিদা থেকে বঞ্চিত করে বৌ বেপরোয়া জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আনন্দ-ফুর্তিতে টাকা ওড়াতে দেখে ক্ষোভে, দুঃখে বৌয়ের সঙ্গে শাশুড়ি দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বৌয়ের দাপট, ভয়-ডরে ছেলেকে খবর পাঠাতে পারে না।

আমিও প্রবাসে শ্রম দিয়ে এসেছি। উপলব্ধি করি, নিদারুণ সুখের প্রত্যাশায় বিদেশে পাড়ি জমালে ভুক্তভোগীর কথা কেউ কোনোদিন বুঝতে পারবে না সে দেশে উপার্জিত প্রতিটি টাকা কতোটা ঘাম ঝরানো, কষ্টে মাখানো।

সত্য গোপন থাকে না। অন্যের মাধ্যমে স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতার কথা শুনে অভিমানে ছেলে পাচ বছর দেশে আসে না। অবশেষে মায়ের কান্নাকাটি, অনুনয়-বিনয়ের পর ২০০৩ সালের প্রথম দিকে দেশের আসার কথা জানিয়ে চিঠি পাঠালে মা শান্ত হন।

ছেলের আসার সংবাদে এই ভালো, এই অসুস্থ মা সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! রমজানের ঈদের নামাজ শেষে বন্ধুর বাসায় যাওয়ার পথে সউদি আরবে ছেলেটি রাস্তায় দুর্ঘটনায় মারা যায়। কেউ না বললেও ছেলের আসতে দেরি দেখে মায়ের মনে অশনিসংকেত বেজে ওঠে। আইনগত জটিলতার কারণে দেরি করে লাশ সম্প্রতি দেশে পৌছালে বৌয়ের চোখে-মুখে লেশমাত্র ভাবান্তর নেই। অতি কাছের

আত্মীয়দের আচার–আচরণ স্বাভাবিক। কেউ সঞ্চয়ের টাকার হিসাব কষছে, কেউ টাকা ধার নিতে ধরনা দিচ্ছে, কেউ বা বড় অনুষ্ঠান করে মৃত্যুর সৎকারের প্রস্তাব রাখছে।

ব্যতিক্রমী দুঃখিনী মা, ছেলের লাশ মায়ের সামনে – একই করুণ দৃশ্য বোধহয় পৃথিবীতে সবচেয়ে কষ্টদায়ক। মায়ের সঙ্গে সন্তানের বন্ধন নাড়ির সঙ্গে সম্পৃক্ত, কখনো ছিন্ন হওয়ার নয় কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া।

পৃথিবীর তাবৎ সুন্দর সান্ত্বনার বাণী মহিলাকে সামান্যতম স্পর্শ করতে পারছে না। *মৃত যোদ্ধাকে বাড়ি আনা হলো* শীর্ষক ইংরেজি কবিতাটিতে (ইন্টারমিডিয়েট পড়েছিলাম) যোদ্ধা স্বামীর লাশ দেশে স্ত্রী বাকরুদ্ধ। হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মরে যাওয়ার ভয়ে নব্বই বছর বয়সী এক বৃদ্ধ মৃত যোদ্ধার স্ত্রীর সামনে ছোট ছেলেকে ধরতেই একে জড়িয়ে তিনি কেদে ওঠেন। বিপদ কেটে যায়। *অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর।*

কবিতার মহিলার মতো ছেলে হারিয়ে এ বৃদ্ধা নির্বাক। ভাইপোকে মহিলার কাছে পাঠাতে তাকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে সে কি বিলাপ। হয়তো হারানো ছেলের মুখচ্ছবি অন্যের মাধ্যমে প্রতিবিম্ব হয়ে বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছিল। একমাত্র সন্তান হারিয়ে মহিলা এখনো বেচে আছেন। তবে কিছুটা উদভ্রান্তের মতো।

পৃথিবীতে বেচে থাকাই বোধহয় সবচেয়ে আনন্দের।

গাজীপুর থেকে

সিংগাপুরের দিনগুলো

– নাহার সিদ্দিকী

কলম্বো প্ল্যান স্টাফ কলেজ তখন সিংগাপুরের অর্চাড রোডে। আমার স্বামী এম.এম.আর. সিদ্দিকী সেখানে ফ্যাকাল্টি কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন। সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা এবং নিয়মানুবর্তিতার শহর সিংগাপুর ভালো না লেগে উপায় নেই। সেই প্রবাস জীবনের কয়েকটি নিতান্তই ছোট ঘটনা আজও মনে পরে।

তানজুম পাগার প্লাজা এলাকাটি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের কাছাকাছি। সেন্টোসা আইল্যান্ডে যেতে হলে এদিক দিয়েই যেতে হয়। সেখানে পঞ্চাশতলা একটি বাড়ির চোদ্দতলায় ভাড়া নেয়া হলো একটি ফ্ল্যাট।

দুই বেডরুম, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন নিয়ে ছিমছাম সাজানো বাড়ি। চাংগি এয়ারপোর্টের ফুলেল পরিবেশ থেকে যাত্রা শুরু করে রাস্তার দুইপাশে, এমনকি ওভারবৃজের ওপরেও ফুলের অপরূপ সম্ভার দেখতে দেখতে পৌছে গেলাম নির্ধারিত স্থানে।

এতো উচুতে থাকতে হবে! মাটির ছোয়া পেতে গেলে লিফট ছাড়া উপায় নেই ভেবে কেমন জানি অস্বস্তি লাগছিল। যাক, বাসায় ঢুকতে যাচ্ছি, ড্রয়িংরুমের সামনে দেখি স্যানডাল রাখা আছে। শোয়ার ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম সব জায়গায় দেখলাম আলাদা আলাদা স্যানডাল সযত্নে সাজানো রয়েছে।

পরের দিন ল্যান্ডলেডি একজন চায়নিজ মহিলা এলেন দেখা করতে। স্যানডালের রহস্য ভাঙলেন। জানালেন প্রতিটি রুমের জন্যই সিংগাপুরবাসী সম্পূর্ণ আলাদা স্যানডাল ব্যবহার করে থাকে। রান্নাঘরের জুতো শোয়ার ঘরে বা ড্রয়িংরুমের জুতো রান্নাঘরে অবশ্যই পরিত্যাজ্য। জীবাণুমুক্ত থাকার জন্যই এ ব্যবস্থা।

সিংগাপুর একটি সিটি স্টেট। ঘনবসতিপূর্ণ যদিও সুন্দর পরিকল্পনার জন্য চোখের দৃষ্টি ব্যাহত হয় না। ছোয়াচে রোগগুলো সহজে আক্রমণ করতে পারে না। ধন্যবাদ জানালাম ল্যান্ডলেডিকে। পরে অবশ্য স্যানডাল নতুন করে কিনেছি। কারণ চায়নিজ মহিলার পায়ের মাপ আমার চেয়ে ছোট। পরে খেয়াল করলাম, সবার বাড়ির সামনে স্যানডাল, জুতা রাখার ব্যবস্থা। পাবলিক প্লেস ছাড়া কোথাও জুতার স্টাইল দেখানোর উপায় নেই।

ল্যান্ডলেডি আমেরিকা যাচ্ছেন আর্টসের একটি বিষয়ে মাস্টার্স করার জন্য। কেন, দেশে কি মাস্টার্স করার ব্যবস্থা নেই? আমার প্রশ্ন।

আছে। তবে সিট সংখ্যা খুবই সীমিত। এই ছোট্ট দেশটির চাহিদা অনুযায়ী ইউনিভার্সিটি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা, একটিও বেশি ভর্তি করা যাবে না। সুতরাং মেধায় টিকতে না পারলে দেশের বাইরে যাও। দেশের ভেতরে যারা পাস করবে তাদের চাকরি নিশ্চিত। তবে হায়ার সেকেন্ডারি করা উন্মুক্ত। তারা মোটামুটি সচ্ছল থাকার মতো চাকরি পেয়ে যায়। সরকার কর্তৃক দেয়া অল্প সুদে ঋণে বাড়ি কেনা বা অন্যান্য সুবিধাদি তো আছেই।

ফ্ল্যাটের অন্যদের কথা জিজ্ঞাসা করলাম যারা একই ফ্লোরে থাকেন। আমাদের ঠিক সামনের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা নাকি অমিশুক এবং কিছুটা অহংকারী। যাক, খুব ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলাম। আজ যাই জুডং তো কাল সেন্টোসা।

একদিন সকালে আমার কিশোরী মেয়ে রিমু বললো, আম্মা দেখো, সামনের বাসার বাইরের দরজাটা আমাদেরটার চেয়ে পরিষ্কার, আমাদেরটা আরো মুছতে হবে।

বলেই সে পরিষ্কার করার সাজ–সরঞ্জাম নিয়ে দরজায় টুলের ওপর দাড়িয়ে গেল।

মজার বিষয়, সামনের ফ্ল্যাটের মহিলা বের হচ্ছিলেন। তিনি প্রাতঃসম্ভাষণ জানালেন। আমরা নতুন এসেছি নাকি জানতে চাইলেন। এরপর থেকে প্রতিদিন তারাই নিজ থেকে এগিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলো। বুঝলাম পরিষ্কার থাকাই আমাদের মর্যাদাটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

সন্ধ্যা হলেই দেখা যায়, চারদিকের ফ্ল্যাটগুলোর জানালায় শাদা শাদা হাত সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় রত। রবিবারে ঘুম ভাঙে পানির শব্দে। হোস পাইপ দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছে করিডোর, বারান্দা। ফুটপাথগুলো ধোয়া–মোছা হচ্ছে। ফুটপাথ দিয়ে হেটে কি আরাম! মাইলের পর মাইল হাটতেও ক্লান্তি লাগে না।

ঢাকায় কি আমরা ইচ্ছে থাকলেও এক এলাকা থেকে আরেক এলাকা হেটে যেতে পারি? ডায়াবেটিস এবং ব্লাড প্রেশার এখন ঘরে ঘরে। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট করতে পারি না সেটাও অবশ্য অন্যতম কারণ এই অসুখগুলোর পেছনে।

সকালে খবরের কাগজ পড়লে দৃষ্টি আটকে যায় হেডলাইনগুলো দেখলে। ওমুক গ্রেফতার। কারণ ছয়তলা থেকে একটি ক্যান ফেলেছে অথবা একটি টিসুপেপার পার্কে ফেলেছে। বারান্দায় দাড়িয়ে দাড়িয়ে চুল আচড়াতাম অনেক সময়। কিন্তু ঝরা চুলগুলো ছুড়ে ফেলতাম না। বলা যায় না কি পরিণাম হয়!

দুই তিন মাস পরে দেখছি একটি ফেস্টিভাল চলছে। চৌরাস্তার কোণে অথবা রাস্তার পাশে সযত্নে রাখা আছে মুরগির রোস্ট অথবা পোড়ানো ছাই। কি ব্যাপার জানা দরকার। রাস্তার পাশে এসব রেখেও কেউ গ্রেফতার হচ্ছে না।

ব্যাপারটা কি? শুনলাম ভূত তাড়ানোর জন্য এ ব্যবস্থা। নব্য চায়নিজদেরও কুসংস্কার রয়েছে বিদেহি আত্মাদের সন্তুষ্ট করার জন্য পরিচ্ছন্ন রাস্তায় খাবারের সমাহার।

এদিকে আমাদের ফ্ল্যাটের কোনো এক ফ্লোরে একজন বয়স্ক ব্যক্তি মারা গেছেন। শোক পালনের অভিনব ব্যবস্থা দেখে অবাক হওয়ার পালা। আমাদের ফ্ল্যাট ঘেষেই টেম্পোরারি টেন্টের ঘর তৈরি হলো। সেখানে দুই তিনটি ঘর কল, বাথরুম খাবার ব্যবস্থা। দলে দলে প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন আসতে লাগলো। কয়েকদিন ধরে এ ব্যবস্থা। নিকট আত্মীয়স্বজনদের জন্য শোকের প্রকাশ স্বরূপ নির্দিষ্ট পোশাকও পরতে হয়।

একদিন দেখি কয়েকজন সত্যি সত্যি ছালার পোশাক পরেছে। এতোদিন শুধু ইনডিয়ানই শুনেছিলাম স্যাক ড্রেস পরে। শেষকৃত্যের দিন দেখলাম ঢাকঢোল বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে সবাই যাচ্ছে। যে কয়েকদিন শবদেহ

টেন্টে ছিল সেদিকে তাকালে রাতের বেলায় গা ছমছম করতো। মৃতদেহ এতোদিন রেখেছে নিশ্চয় কোনো বিশেষ ব্যবস্থায়। আমি তো ভয়ে এদিক পা রাখিনি।

বৃহত্তর ঢাকার সমান হবে সিংগাপুরের মোট আয়তন। নানান কারণে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে দেশটি। বাংলাদেশে অনেক গ্রামের লোকও সিংগাপুরের নাম জানে। সিংগাপুরের অনেক ট্যাকসি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করেছি বাংলাদেশকে চেনে কি না জানতে। কিন্তু না, শতকরা আশি নব্বই ভাগই চেনে না বাংলাদেশ নামে সবুজ–শ্যামল দেশটিকে।

তবে একজন ড্রাইভার বললো, হ্যা, বাংলাদেশকে চিনি।

আমার স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ধার দেবে নাকি আমাদেরকে?

উত্তর দিল, একদিন তাহলে প্রধানমন্ত্রীকে তোমাদের কেউ মেরে ফেলে বলবে, ভুল হয়ে গেছে।

কেমন লাগলো আমাদের বুঝতেই পারছেন। যাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারে পানি পর্যন্ত ভাহুরবাড়ু, মালয়শিয়া হয়ে আসে তাদেরও এতোখানি আত্মপ্রত্যয় ও অহংকার! অবশ্য আমরা বাংলাদেশিরা সুযোগ দিয়েছি বলেই তো।

দশ বছর পরে আবার সিংগাপুর গিয়েছি। যে সিংগাপুর দেখেছিলাম সেই চমৎকার সিংগাপুরই রয়ে গেছে। বৃষ্টির পানি ধরে রেখে জলাধার করেছে। আমাদের এতো বৃষ্টির জলধারা ধরে রাখার কি কোনো ব্যবস্থা নেই?

নিমন্ত্রণে এক বাসায় গেলাম। টেবিলে গৃহকর্তার কিশোর ছেলেটি বলছে, বন্ধে তো প্রতিদিনই মজার মজার খেলাম। স্কুলে মজাটি টের পাবো। শুনলাম স্কুলে ওজন নেয়। প্রতিটি ছেলের তুলনামূলকভাবে ওজন বেড়ে গেলে টিফিনে হালকা খাবার দেবে এবং ব্যায়ামের সময়টা বাড়িয়ে দেবে। বাবা মা কতো নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ছেলের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে।

উড়িরচরে যখন প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল তখন সে খবর সিংগাপুরের কাগজে বড় বড় করে লিখেছিল। আমাদের বিদেশের বন্ধুরা ফোনে এবং দেখা হলে আমাদের আত্মীয়স্বজনদের কুশল জানতে চেয়েছিলেন যে উড়িরচরকে একমাত্র ম্যাপে ছাড়া কোথাও দেখিনি।

সিংগাপুরের সরকার পরিবারের বন্ধনের ভালো দিকগুলোকে অনুধাবন করেছে সম্যকভাবে। তাই মা–বাবার বাসার কাছে ফ্ল্যাট কিনলে ছেলেমেয়েদের বিশেষ সুবিধা দেয়। এশিয়ান মূল্যবোধের ওপরও জোর দিয়ে থাকে। অবশ্য পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রবলভাবে পড়েছে আজকের সিংগাপুরবাসীর ওপর। এই হলো সংক্ষেপে আমার অর্থাৎ সিংগাপুরে কথা।

মিরপুর, ঢাকা থেকে